বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন

অধ্যাপক শফিউল আলম

আবুল মোমেন

অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক

অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক

সৈয়দ মাহফুজ আলী

অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন

অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ

ড. সেলিনা আক্তার

ফাহ্‌মিদা হক

ড. উত্তম কুমার দাশ

আনোয়ারুল হক

সৈয়দা সঙ্গীতা ইমাম

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১১

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০২০

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদে দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ষষ্ঠ শ্রেণির **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি ও জনসংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে পারবে। পাশাপাশি তারা বৃহৎ পরিসরে নিজের অবস্থান ও পরিচিতি নির্মাণে সক্ষম হবে। আশা করা যায়, বিষয়বস্তু চর্চার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে দায়িত্বশীল বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে নিজ সমাজের অগ্রগতি এবং বিশ্বসমাজের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালনেও সক্ষম হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস	১—৮
দ্বিতীয়	বাংলাদেশের ইতিহাস	৯—১৭
তৃতীয়	বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সমাজ	১৮—২২
চতুর্থ	বাংলাদেশের অর্থনীতি	২৩—৩২
পঞ্চম	বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক	৩৩—৪১
ষষ্ঠ	বাংলাদেশের পরিবেশ	৪২—৪৭
সপ্তম	শিশুর বেড়ে ওঠা ও প্রতিবন্ধকতা: সামাজিকীকরণ	৪৮—৫৪
অষ্টম	বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	৫৫—৫৯

প্রথম অধ্যায়
সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তা জুড়ে রয়েছে মানুষ, আর নানা প্রজাতির গাছপালা, জীবজন্তু ও সামুদ্রিক প্রাণী। আদিমকালে জীবজন্তুর আক্রমণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা বিপদের সামনে মানুষ ছিল অসহায়। অস্তিত্ব রক্ষা আর জীবনযাপনের চাহিদা পূরণের জন্য তারা একে অন্যকে সহযোগিতা করার প্রয়োজন অনুভব করে। এভাবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে গিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে সমাজ। শুধু মানুষই নয়, পশুপাখি এবং কীটপতঙ্গের মাঝেও আমরা দলবদ্ধ জীবনধারা লক্ষ করি। যেমন- হাতি দল বেঁধে একসঙ্গে চলাফেরা করতে ভালোবাসে। কোনো কাক বিপদে পড়লে দল বেঁধে সব কাক তাকে বাঁচাতে ছুটে আসে। মৌমাছিরা মৌচাক এবং উইপোকা ঢিপি তৈরি করে তার মাঝে সবাই মিলেমিশে থাকে। বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার ধারাকে বুঝতে সমাজ কী ও কীভাবে তা গড়ে উঠেছে- এ অধ্যায়ের পাঠগুলোতে আমরা সে সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- সমাজের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সমাজজীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারব;
- সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর যেমন-শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক, উদ্যানকৃষি, পশুপালন, কৃষিভিত্তিক, শিল্পভিত্তিক ও শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী সমাজের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- কৃষিভিত্তিক সমাজ ও আধুনিক সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির তুলনা করতে পারব;
- সমাজ বিকাশে বিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধি করব।

পাঠ-১: সমাজের ধারণা

মানুষ একাকী বাস করতে চায় না। নিরাপদে ও শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য সবাই দলবদ্ধভাবে বাস করে। যার ফলে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি, দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক নির্ভরতার মতো বিভিন্ন সম্পর্ক। এসবই হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক। মিলেমিশে থাকা একতাবদ্ধ মানবগোষ্ঠীকে বলা হয় সমাজ।

সমাজের মধ্যে ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠান ও সংঘ থাকে। যেমন- পরিবার, গোত্র, ক্লাব, সমিতি ইত্যাদি। আমরা কোনো না কোনো পরিবারে বাস করি। মা-বাবা তাদের এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে একসাথে বসবাস করে যা এক রকমের পরিবার। কোনো কোনো পরিবারে বাবা-মা ও তাদের সন্তান ছাড়াও তাদের ভাই-বোন অথবা মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, দাদা-দাদিসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বন্ধন ও কার্যকলাপের সমন্বয়ে পরিবার গড়ে ওঠে। সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার। প্রাচীন কালে সমাজ গঠনের আগে পরিবার বলতে কিছু ছিল না। মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে বাঁচতে হতো। তাই খাদ্য

সংগ্রহ ও হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এভাবেই মানুষ সমাজ গড়ে তোলে। পরিবার থেকে গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ। এভাবে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সমাজের উদ্ভব হয়েছে।

সাধারণভাবে সমাজের দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এর প্রথমটি হচ্ছে, বহুলোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সংঘবদ্ধতার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকা। সুতরাং সমাজ বলতে আমরা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝি, যার ভিত্তিতে মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে সমবেতভাবে বাস করে।

কাজ: দলে ভাগ হয়ে আদিম সমাজের দলবদ্ধ কাজগুলোর অভিনয় কর।

পাঠ-২: সমাজ জীবনে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

মানুষের জীবন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। জীবনধারণের জন্য মানুষ যেমন পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আবার অনেকক্ষেত্রে পরিবেশই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য মানব সমাজের প্রকৃতি, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির উপর পরিবেশের প্রভাব স্পষ্ট।

নদী মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে দেয়। পৃথিবীর প্রধান সভ্যতাগুলো ছিল নদীভিত্তিক। যেমন- সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা গঙ্গা অববাহিকায় বিকাশ লাভ করেছে।

আবার কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর পেশা নির্ভর করে। যেমন- খনি অঞ্চলে খনি-শ্রমিক ও শিল্প এলাকায় শিল্প-শ্রমিক বাস করে। নদীমাতৃক দেশ বলে বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের যানবাহন হচ্ছে নৌকা, লঞ্চ ও স্টিমার। আবার কোনো কোনো এলাকার যানবাহন রেলগাড়ি, বাস, রিকশা ও গরুর গাড়ি ইত্যাদি।

কুটিরশিল্প বিকাশেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। নদীবহুল এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে ঢাকার ডেমরায় তাঁতিরা বাস করে এবং এখানেই বিখ্যাত ঢাকাই শাড়ি বোনা হয়। রাজশাহীতে রেশমি শাড়ি তৈরির জন্য বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে। কারণ এ অঞ্চলে তুঁতগাছ জন্মে এবং তুঁতগাছে রেশম কীট বাসা বাঁধে।

ফরিদপুরের খেজুরগুড়, মুক্তাগাছার মন্ডা, টাঙ্গাইলের শাড়ি, সুন্দরবনের মধু, সিলেটের শীতল পাটি প্রভৃতি ঐ সব এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। সোনারগাঁও এর বিখ্যাত মসলিন শিল্পও এ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও কাঁচামালের সহজলভ্যতার জন্যই বিকাশ লাভ করেছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঘরবাড়ির বৈশিষ্ট্যও ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ গরম পশমি কাপড় পরে আর গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার মানুষ পরে হালকা সুতি কাপড়। যেসব অঞ্চলে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় সেখানকার মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করতে কাঠ বেশি ব্যবহার করে। যেসব এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত সেখানে সহজেই শিল্পায়ন ঘটে এবং নগর গড়ে ওঠে। নৌ-যোগাযোগ ভালো বলে নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে অনেক আগে থেকেই শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

কাজঃ বাংলাদেশের মানচিত্রে শাড়ি, শীতলপাটি, রেশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত স্থানগুলো চিহ্নিত কর।

পাঠ-৩ ও ৪: সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরঃ শিকার ও সংগ্রহ, উদ্যানকৃষি ও পশুপালন সমাজ

সমাজ পরিবর্তনশীল। আজকের দিনে আমরা বাংলাদেশের যে সমাজকে দেখছি, আগের দিনের সমাজ কিন্তু এরকম ছিল না। আজকের সমাজ দীর্ঘকালের বিকাশধারার ফল। কালে কালে জ্ঞান- বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পুরানো সমাজ পরিবর্তন হয়ে একালের আধুনিক সমাজ গঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে সমাজ আরও পরিবর্তন হবে। কালের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে সমাজের পরিবর্তনকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ (১) শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক সমাজ (২) উদ্যান কৃষিভিত্তিক সমাজ (৩) পশুপালন সমাজ (৪) কৃষিভিত্তিক সমাজ (৫) শিল্পভিত্তিক সমাজ (৬) শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজ।

শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজ

শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজ হচ্ছে মানব সমাজের আদিমতম রূপ। তখন স্থায়ী কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। মানুষ গুহায় ও বনজঙ্গলে বাস করত। প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল প্রচুর। কিন্তু এ সম্পদকে ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। বনজঙ্গল থেকে তারা খাবার খুঁজে নিত আর শিকার করত। খাবারের খোঁজে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত।

ফলমূলসংগ্রহ, পশুপাখি ও মৎস্য শিকার ছিল আদিম সমাজের প্রধান কাজ। যখন শিকার মিলত তখন তারা খেতো, শিকার না মিললে উপোস থাকতে হতো। মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করত আর পুরুষেরা শিকার করত। সেসময় পাথরই ছিল একমাত্র হাতিয়ার। এ কারণে এ সমাজকে প্রাগৈতিহাসিক বা প্রস্তরযুগের সমাজও বলা হয়। এ সমাজের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ারগুলো হচ্ছে-খাঁজকাটা বল্লম, মাছ ধরার হারপুন এবং হাড়ের সুই ইত্যাদি। শীত ও রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ গাছের ছাল ও লতাপাতা এবং পশুর চামড়া ব্যবহার করত।

আদিম সমাজে খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার

এ সমাজের মানুষ কোনো শক্তিশালী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেনি। মানুষকে তখন খাবারের সন্ধানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়াতে হতো।

উদ্যান কৃষিভিত্তিক সমাজ

এ সমাজে খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ খাদ্য উৎপাদনকারীতে পরিণত হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, মেয়েরাই কৃষিকাজের উদ্ভাবন করেছে। আদিম সমাজে পুরুষেরা যেত শিকারের সন্ধানে, ফলমূল আহরণের ভার ছিল মেয়েদের উপর। ফলমূল সংগ্রহ করতে গিয়ে কখনো তারা নিয়ে আসত বুনো গম ও বার্লি, মেটে আলু, কচুর

মূল ও কন্দ। আস্তানার আশপাশে গম ও বার্লির যেসব দানা পড়ত তা থেকে গজিয়ে উঠত চারা গাছ। চারা গাছে পরে দেখা দিত শিষ ও দানা। এ ধরনের ঘটনা থেকে বীজ ছিটিয়ে খাওয়ার উপযোগী শস্য পাওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কৃষিকাজের এ পর্যায়কে বলা হয় উদ্যান চাষ। এক্ষেত্রে প্রথমে মেয়েরা তাদের বসবাসের আশপাশে পতিত জমিতে একটি লম্বা লাঠি বা পশুর শিং দিয়ে মাটি চিরে গর্তে বীজ ফেলে ফসল ও ফলমূল উৎপাদন করত। ফসল পাকলে পশুর চোয়ালের হাড় দিয়ে ফসল কাটত। তবে প্রয়োজনের বেশি ফসল তারা উৎপাদন করেনি। এক জায়গায় বারবার এমন ফসল ফলানো যেতো না বলে তাদের জীবন ছিল যাযাবর প্রকৃতির।

পশুপালন সমাজ

সমাজ বিকাশের ধারায় পশুপালন শুরু হলে সমাজ আরও এগিয়ে যায়। এ সমাজের মানুষ খাদ্য সংগ্রহের পাশাপাশি পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। শিকারি মানুষ প্রথমে কুকুরকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে। কুকুর ছিল বিশ্বস্ত প্রহরী ও শিকারের সঙ্গী। অনেক সময় বুনো ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি পশু মানুষের হাতে ধরা পড়ত। সেগুলোকে তারা ধরে এনে বেঁধে রাখত। এগুলো ছিল তাদের জীবন্ত খাদ্যভাণ্ডার। শিকার না মিললে এগুলোকে বধ করে আহার করত। মানুষ ক্রমে বুঝতে পারে গরু, ছাগল ভেড়াকে না মেরে এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখলে বেশি লাভজনক হবে। যেমন- প্রতিদিন দুধ ও বছর বছর বাচ্চা পাওয়া যাবে, চামড়া ও পশমকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যাবে। এভাবে সমাজে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বেড়ে তা মানুষের সম্পদে পরিণত হয়।

এ সমাজে মুদ্রার প্রচলন হয়নি। তবে দ্রব্য বিনিময় প্রথার উদ্ভব ঘটে। একজনের পণ্যের সঙ্গে অন্য পশু কিংবা অন্য কিছু বদল করা হতো। তবে আদিম সমাজের মতো এ সমাজের মানুষও যাযাবর জীবনযাপন করত

পশুপালন সমাজে পশুপালন

কাজঃ দলে ভাগ হয়ে উল্লিখিত তিনটি সমাজের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে উপস্থাপন কর।

পাঠ-৫ ও ৬ : সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর: কৃষি, শিল্প ও শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজ

কৃষিভিত্তিক সমাজ

কৃষিকাজের সূচনা মেয়েরা করলেও লাঙল আবিষ্কারের পর পুরুষেরা জমি চাষের দায়িত্ব নেয়। প্রথমে তারা নিজের কাঁধে জোয়াল নিয়ে জমি চাষ শুরু করে। কালক্রমে হালের বলদের ব্যবহার শুরু হয়। লাঙল ও হালের বলদ ব্যবহার করে চাষ শুরু হলে উৎপাদন বাড়তে থাকে। যেসব অঞ্চলে বন্যা হতো এবং জমিতে পলি পড়ত মানুষ সেসব জমিতে গম ও বার্লির বীজ ছিটিয়ে দিত। এসব অঞ্চল ছিল টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা, নীল নদের তীর ও সিন্ধু উপত্যকা। সে যুগে পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রচুর বৃষ্টি হতো। তাই কৃষিকাজ এসব অঞ্চলে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। পরে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়ে। কৃষিকাজ প্রসারের সাথে সাথে পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়।

কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে সমাজজীবন ও সভ্যতার উন্নতি হতে থাকে। কৃষিকাজের উপযোগী স্থানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মানুষ স্থায়ীভাবে এক স্থানে বসবাস শুরু করে। কৃষিকাজ মানুষের খাদ্যের সংস্থান আরও নিশ্চিত করে। এ সমাজের উদ্বৃত্ত ফসল অবসর জীবনযাপনকারী শ্রেণির উদ্ভব করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে এবং নগর জীবনের বিকাশে ভূমিকা রাখে। কৃষির উদ্বৃত্ত ফসল সভ্যতার সূচনা করে। এ কারণে বলা হয়, সভ্যতা হচ্ছে কৃষির অবদান।

শিল্পভিত্তিক সমাজ

ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ দিকে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়ে যায়। ইউরোপের মানুষ আবিষ্কার করে প্রাচীন গ্রিস এবং রোমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য। এটি ইউরোপের নবজাগৃতি বা রেনেসাঁ নামে পরিচিত। এই সময়ে ইউরোপের মানুষ বেরিয়ে পড়ে অজানাকে জানতে, পৃথিবীকে আবিষ্কার করতে। ১৪৯২ সালে কলম্বাস পৌঁছে গেলেন আমেরিকায়।
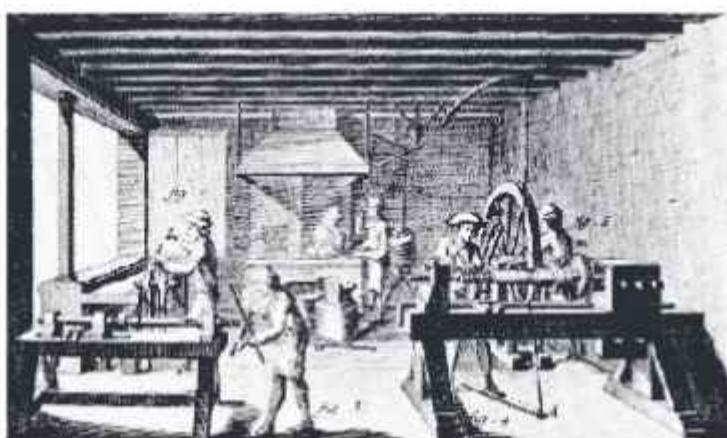
শিল্পভিত্তিক সমাজে যন্ত্রচালিত উৎপাদন

১৬৮৫ সালে নিউটন তুলে ধরলেন তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ। এভাবে শুরু হলো একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার হলে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ধারণা কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা পরপর আবিষ্কার করেন সুতা কাটার মাকু বা স্পিনিং মেশিন, যান্ত্রিক তাঁত, বাষ্পচালিত জাহাজ ও রেলের ইঞ্জিন। এ সময় বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়। আর স্টিম টারবাইন নামে বিশেষ ধরনের বাষ্পীয় ইঞ্জিন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। এভাবে একদিকে বড়ো বড়ো শিল্পকারখানায় উৎপাদন শুরু হয় আর অন্যদিকে দ্রুতগামী জাহাজ ও রেলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের বিস্তার ঘটে। এভাবেই সূচনা হয় শিল্পবিপ্লবের। শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল ইউরোপে, পথিকৃৎ ছিল ইংল্যান্ড।

আঠারো-উনিশ শতকে কয়লা, গ্যাস, পেট্রোল ও বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়। উনিশ শতকে রেল যোগাযোগ চালু হয়। ক্রমবর্ধমান শিল্প কারখানার শ্রম ও কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে ইউরোপের মানুষ উপনিবেশ স্থাপন করল মূলত এশিয়া ও আফ্রিকায়। তখন থেকে বিশ্বব্যাপী শিল্পবিপ্লবের প্রভাব পড়তে থাকে। বিশ শতকে শুরু হয় বিমান, রেডিয়ো, সিনেমা ও টেলিভিশনের ব্যবহার।

শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজ

শিল্পভিত্তিক সমাজে শক্তির উৎস হিসাবে মানুষ ও পশুর স্থান দখল করে যন্ত্র। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজের ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান ও তথ্য। শিল্পের বদলে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করাই হচ্ছে অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। সম্পত্তির মালিকদের বদলে পেশাজীবী, চাকরিজীবী, বিজ্ঞানী, তথ্য প্রকৌশলী এবং সেবা ও বিনোদন খাতের সাথে যুক্ত মানুষেরাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন এবং যোগাযোগের নানা মাধ্যম যেমন ফেসবুক পৃথিবীর মানুষকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বলা হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে বিশ্বায়ন।

কাজ: দলে ভাগ হয়ে কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

পাঠ-৭: বাংলাদেশের সমাজের প্রকৃতি

কালের অগ্রযাত্রায় আজ বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তন হয়ে আধুনিক সমাজে রূপ পেয়েছে। কুমিল্লার লালমাই, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে বাঙালির প্রাচীন বসতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাঙালির এই আদি পুরুষরাই এ অঞ্চলে কৃষির সূচনা করেছিল। তখন কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন হতো। এ উদ্বৃত্ত ফসলের উপর নির্ভর করেই বিকশিত হয় আরও কিছু পেশা। যেমন- কারিগর, ব্যবসায়ী, শ্রমিক। কৃষিপ্রধান সমাজে কৃষিকে কেন্দ্র করেই উদ্ভব ঘটে নানা লোকাচার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও উৎসবের। কৃষিকাজের পাশাপাশি তখন পশুশিকার ও পশুপালনও ছিল।

তবে অষ্টাদশ শতকে পলাশীর যুদ্ধে হারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক যুগে প্রবেশ করে। যে যুগে এ অঞ্চলের যেকোনো শিল্প সৃষ্টির চেষ্টাকে ব্রিটিশ রাজ্যের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী নির্দেশিত হতে হতো। এ কারণে ব্রিটিশ আমলে এদেশের স্থানীয় শিল্পায়নের সম্ভাবনা নষ্ট করে গড়ে ওঠে পর নির্ভর উন্নয়ন ভাবনা যা পাকিস্তান আমল পর্যন্ত চালু থাকে। সমাজ বিকাশের একটা স্তরে প্রবেশ করা মানেই যে পূর্ববর্তী স্তর বিলুপ্ত হয়ে যায় তা নয়। তাই বাংলাদেশের নগরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী বর্তমানে শিল্পভিত্তিক সমাজ ও শিল্পবিপ্লব-উত্তর সমাজে প্রবেশ করলেও তার পূর্ববর্তী ঐতিহ্যগুলোকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধারণ করে আছে। তাই এখনও উদ্যানকৃষি, পশুপালন, কৃষি আমাদের অর্থনীতিতে বড়ো ভূমিকা রাখছে। এখনো এদেশে উদ্যানকৃষি নির্ভর গারো, ত্রিপুরা, চাকমা নৃ-গোষ্ঠীরা যেমন আছে, তেমনি আছে পশুপালক গোষ্ঠী। আবার ছোটো চাষী যেমন পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী কৃষিকে টিকিয়ে রাখছেন, তবে সাথে সাথে বড় পুঁজির বাজারমুখী কৃষক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানাও অপ্রতুল নয়। আর ভারীশিল্পও বিকাশিত হয়েছে ইদানীং। যদিও পাকিস্তানি আমলে শাসকদের অবহেলার কারণে শিল্পের বিকাশ ঘটেনি, কিন্তু স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসার ঘটে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার মতো শহরগুলোতেও এর প্রান্তসীমায় বড়ো আকারের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

তবে বর্তমানে শিল্পবিপ্লব-উত্তর যুগে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষের সময়ে বাংলাদেশও যোগ দিয়েছে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবে। এখন বাংলাদেশের প্রশাসনিক, শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সর্বত্রই ব্যবহার হচ্ছে ইন্টারনেট, সফটওয়ার, নেটওয়ার্কিংসহ নানা মাত্রার প্রযুক্তি জ্ঞান।

কাজ-: "বাংলাদেশের সমাজ যেন মানব সমাজ বিকাশের স্তরসমূহের ধারাবাহিক ফসল"-বিশ্লেষণ কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ কোনটি?

ক. গোত্র গ. সম্প্রদায়
খ. গোষ্ঠী ঘ. পরিবার

২. নারীই প্রথম কৃষি কাজ শুরু করেন, কারণ তাদের ছিল -

i. সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি
ii. খাবার সংগ্রহের দায়িত্ব পালন
iii. দায়িত্বপালনের বাধ্যবাধকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. i ও ii
খ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্কুল মাঠে একটি মেলা হচ্ছে। একটি স্টল স্পিনিং মেশিন, কাপড় বুননের তাঁত, বিদ্যুৎ তৈরির ছোটো ছোটো প্রজেক্ট দিয়ে সাজানো হয়েছে।

৩. অনুচ্ছেদে স্টলটিতে কোন সমাজের নিদর্শন রয়েছে?

ক. শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক	গ. কৃষিভিত্তিক

খ. উদ্যান কৃষিভিত্তিক	ঘ. শিল্পভিত্তিক

৪. উক্ত সমাজ ব্যবস্থার ফলে -

i. অধিক উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে

ii. কৃষির সূচনা হয়েছে

iii. যোগাযোগ সহজতর হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	গ. i ও iii

খ. i ও ii	ঘ. i, ii ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. পোড়াবাড়ি কিসের জন্য বিখ্যাত?

খ. আদিম মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করত কেন?

গ. উদ্দীপকে ১নং চিত্রটি কোন সমাজের ইঙ্গিত বহন করছে, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ২ নং চিত্রে ইঙ্গিতকারী সমাজের উদ্ভাবক মেয়েরাই-বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের ইতিহাস

১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হলেও বাংলার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। প্রাচীন যুগ থেকে হিসেব করলে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও সেন শাসনের ধারাবাহিকতায় এসেছিল মধ্যযুগ। বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের পর বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। ইলিয়াসশাহী ও হোসেনশাহী বংশ বাংলায় গড়ে তোলে শক্তিশালী শাসন কাঠামো। এরপর পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাংলা ও ভারতবর্ষ চলে গিয়েছিল ইংরেজদের অধীনে। তাদের হাত থেকে মুক্তির পর বর্তমান বাংলাদেশের নাম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি আমাদের এই বাংলাদেশ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- বাংলায় মানব বসতির ধারা বর্ণনা করতে পারব;
- রাজনৈতিক ইতিহাসের যুগ বিভাজন করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন বর্ণনা করতে পারব;
- মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার রাজনৈতিক জীবন বর্ণনা করতে পারব;
- দেশটির জন্মকথা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারব;

পাঠ-১, ২ ও ৩: বাংলাদেশের মানব বসতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে মানব বসতির অস্তিত্ব ছিল। সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শন থেকে প্রমাণ হয়েছে এই ভূমির প্রাচীনতা। চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, সীতাকুণ্ড, কুমিল্লার লালমাই, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া গিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতিয়ার। এর মধ্যে রয়েছে পাথর ও ফসিল, কাঠের হাতকুঠার, বাটালি, তীরের ফলক প্রভৃতি। এই সময়ে মানুষ বনে-বাদাড়ে ঘুরে যাযাবরের মতো জীবনযাপন করেছে।

এরপর বগুড়ার মহাস্থানগড় এবং নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ মানব বসতি। মহাস্থানগড়ে অবস্থিত প্রাচীন নগরটির নাম পুণ্ড্রনগর যা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গড়ে উঠেছিল। ওদিকে উয়ারী-বটেশ্বর থেকেও পাওয়া গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ মানব বসতির চিহ্ন। সমসাময়িক কালে ভারত উপমহাদেশের ১৬টি মহাজনপদের নাম জানা যায়।

উপমহাদেশের বিভিন্ন জনপদের মৌর্য যুগ-পূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাস জানা যায়। তবে বর্তমান বাংলাদেশ অংশের ইতিহাসের প্রাথমিক নিদর্শন হিসেবে প্রাপ্ত শিলালিপিটি মৌর্য যুগের বলে মনে করা হয়। অনেকের মতে লিপিটি সম্রাট অশোকের জারিকৃত। এই শিলালিপির বিবরণ থেকে অনুমান করা হয় মৌর্য সম্রাট অশোক পুণ্ড্রনগর শাসন করেছেন। তারপর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রাজবংশ বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ড শাসন করেছে।

গুপ্ত যুগ

আমাদের দেশের বিস্তারিত ইতিহাস জানা গিয়েছে গুপ্ত যুগ থেকে। তারা ভারত উপমহাদেশের উত্তর অঞ্চলের শাসক ছিলেন। বাংলাদেশের উত্তরাংশে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি নামে একটি প্রদেশ গুপ্তদের শাসনাভুক্ত ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের বাংলাদেশ প্রাচীনকালে একক কোনো দেশ ছিল না। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল তখন পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গ, সমতট, গৌড়, বরেন্দ্র, হরিকেল প্রভৃতি জনপদ নামে পরিচিত ছিল।

শশাঙ্ক

গুপ্ত শাসন পতনের পর কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। 'পরবর্তী গুপ্ত' নামে পরিচিত এই সময়কালের তিনজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। তারপর সপ্তম শতকে শশাঙ্ক নামে একজন প্রতাপশালী শাসকের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গৌড়ের শাসক ছিলেন। তার উপাধি ছিল গৌড়েশ্বর। তার মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর প্রাচীন বাংলায় কোনো স্থায়ী শাসক ছিল না। বিশৃঙ্খল অবস্থায় বাংলার ছোট ছোট রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

পাল রাজবংশ

পাল রাজবংশ বাংলায় দীর্ঘদিন শাসন করে। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল। তিনি 'মাৎস্যন্যায়' তথা মাছের রাজত্বের মতো অরাজকতা দূর করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেছিলেন। গোপালের পর ধর্মপাল, দেবপাল, রামপাল ও মহীপাল ছিলেন এ বংশের বিখ্যাত শাসক ছিলেন। পালবংশ প্রায় ৪০০ বছর বাংলা শাসন করে। তাদের সময়কালে রাজনীতি, অর্থনীতি, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প ও শিল্পকলায় সমৃদ্ধ হয়েছিল বাংলা। নওগাঁ জেলার বিখ্যাত পাহাড়পুর মহাবিহার পালযুগের নিদর্শন।

পাল শাসকদের সময়কালে তাদের রাজত্বের বাইরে কুমিল্লা ও বিক্রমপুর অঞ্চলে খড়গ, দেব, চন্দ্র ও বর্ম রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিল। সমতট অঞ্চল নামে পরিচিত এই এলাকায় ভ্রমণ করেন চীনের বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। তিনি এখানে ৩০টির মতো বৌদ্ধবিহার দেখতে পেয়েছিলেন। তৎকালীন বিক্রমপুর অঞ্চলের প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। তিনি একাদশ শতকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন।

সেন রাজবংশ

ভারতের দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে পালদের সেনাবাহিনীতে চাকরি করার জন্য বাংলায় এসেছিল সেনরা। দুর্বল পাল রাজা মদনপালকে পরাজিত করে বিজয় সেন ক্ষমতা দখল করেন। তারপর রাজা ছিলেন বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন। বিজয় সেন এবং বল্লাল সেন ছিলেন শৈব সম্প্রদায়ের। পরে লক্ষণ সেন হয়ে ওঠেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুরাগী। লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি নদীয়া জয় করেন। তবে লক্ষণ সেনের পর তার দুই ছেলে বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন বিক্রমপুর থেকে কিছুদিন এই এলাকা শাসন করেছিলেন।

কাজ- ১: প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নস্থানগুলো ও প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত উপকরণগুলোর নামের তালিকা প্রস্তুত কর।

কাজ- ২: বাংলার জনপদগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

কাজ- ৩: প্রাচীন বাংলার রাজবংশগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর।

প্রাচীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। সীমিত সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায় মাত্র। আমরা পরবর্তী পাঠগুলোতে প্রাচীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে জানব।

পাঠ-৪: প্রাচীন বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও ধর্ম

কৃষি: প্রাচীনযুগে বাংলার অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। ধান ছিল প্রধান ফসল। প্রচুর আখও উৎপাদন হতো। আখ থেকে উৎপাদন করা হতো গুড় ও চিনি। এই গুড় ও চিনি বিদেশে রপ্তানির কথা জানা গিয়েছে। তুলা, সরিষা ও পান চাষের জন্যও পরিচিতি ছিল বাংলার। তখন নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলা, ডুমুর প্রভৃতি ফলের কথাও জানা যায়।

কুটিরশিল্প: প্রাচীনযুগ থেকেই বাংলার তাঁতিরা মিহি সুতি ও রেশমি কাপড় বুনতে পারদর্শী ছিল। আমাদের মসলিন কাপড় ছিল পৃথিবী বিখ্যাত যা রপ্তানি হতো। তখন উন্নতমানের মৃৎপাত্র, ধাতবপাত্র ও অলংকারও নির্মাণ করা হতো। প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটি, ধাতু ও পাথরের ভাস্কর্য এবং মূর্তি ছিল প্রশংসনীয়। ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা, স্বল্প- মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতিও তৈরি হতো তখন।

ব্যবসা-বাণিজ্য: কৃষির অতিরিক্ত ফসল এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে। নদীর তীরগুলোতে গড়ে উঠেছিল হাট-বাজার ও গঞ্জ। ব্যবসা-বাণিজ্য নদীপথেই হতো বেশি। উয়ারী-বটেশ্বর ও পুণ্ড্রনগর তথা মহাস্থানগড় ছিল সমৃদ্ধ নদীবন্দর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দর ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে প্রেরণ করা হতো তৎকালীন বাংলার পণ্য।

ধর্মমত ও সম্প্রদায়: অনুমান করা হয় পাথর যুগে এ অঞ্চলের মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির পূজা করত। দীর্ঘসময় বৌদ্ধ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। পাল সম্রাটগণ বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ধর্মীয় সম্প্রীতিকে পাল যুগের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হয়।

কাজ: বাংলাদেশের কুটিরশিল্প একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৫: প্রাচীন বাংলার বিনোদন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

বিনোদন: প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে বিনোদনের অংশ হিসেবে নাচ, গান, নাটক, মল্লযুদ্ধ ও কুস্তি খেলার প্রচলন ছিল। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্দিরের সেবাদাসীদের সকলকেই নৃত্য-গীত-বাদ্য পটিয়সী হতে হতো। পোড়ামাটির ফলকে কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, মৃৎভাণ্ড প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়।

স্থাপত্য: প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর থেকে ইট-নির্মিত স্থাপত্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। বাংলার মানুষ স্থাপত্যশিল্পে উৎকর্ষ অর্জন করে পাল শাসনামলে। সম্রাট ধর্মপাল একাই ৫০টি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

সোমপুর মহাবিহার, নওগাঁ (ছবি)

শালবন বিহার, ময়নামতি, কুমিল্লা (ছবি)

ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটি, পাথর ও ধাতব ভাস্কর্য ও মূর্তি প্রাচীন বাংলার শিল্প সম্পর্কে পরিচয় দেয়। গুপ্ত ও পাল যুগের ভাস্কর্যগুলোর শিল্পশৈলী ছিল অনন্য। পাল যুগের দুজন বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী ছিলেন ধীমানপাল ও বীটপাল। ওদিকে সেনযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শূলপাণি। তখনকার বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বৌদ্ধ দেব-দেবীকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো।

কাজ: দলে ভাগ হয়ে বাংলার প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৬: প্রাচীন বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা

ভাষা ও সাহিত্য

বাংলার নানা স্থান থেকে পাথর ও তামার পাতে খোদাই করে লিখিত লিপি পাওয়া গিয়েছে। বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত কালো পাথরে খোদাইকৃত লিপিটি এর মধ্যে প্রাচীনতম। গুপ্ত, পাল ও সেন যুগেরও প্রচুর লিপি পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকদের জারিকৃত লিপির সংখ্যাও অনেক। এই লিপিগুলো থেকে প্রাচীন বাংলার ভাষা ও বর্ণমালা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পালযুগের ঘটনা নিয়ে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থ।

এর পাশাপাশি পাল আমলে আরও রচনা করা হয়েছিল চর্যাপদ। চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃত। সেন রাজাদের মধ্যে রাজা বল্লাল সেন 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' রচনা করেন।

শিক্ষা

পাল যুগের আগে বাংলার শিক্ষা সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। এই সময়ে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দেখে অনুমান করা যায় মৌর্য ও গুপ্ত যুগেও শিক্ষার প্রচলন ছিল। বাংলা থেকে পাল যুগের অনেক বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়েছে। বিহারগুলো ছিল বড়ো পরিসরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধ ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করত। এখানকার শিক্ষকদের বলা হতো আচার্য বা ভিক্ষু। আর শিক্ষার্থীদের বলা হতো শ্রমণ। বর্তমান যুগের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিহারেও ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। বিহারে শুধু ধর্মীয় বই পড়ানো হতো তা নয়-এখানে চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্রসহ নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলার মানুষ বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে ছিল।

কাজ: পাল ও সেন যুগের সাহিত্যকর্মগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৭: মুসলিম শাসনামলে বাংলা

বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয় ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে। তখন রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেন তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি। পর্যায়ক্রমে তুর্কি সেনাপতিরা পুরো বাংলায় শাসন বিস্তার করতে থাকেন। এর আগেই ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিল্লি ছিল তাদের রাজধানী। দিল্লির সুলতানদের পাঠানো সেনাপতিরা বাংলায় প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করতেন। দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব অনেক। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। সম্পদে পরিপূর্ণ হওয়ায় বাংলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসকগণ স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনার ইচ্ছা করতেন। তাঁরা অনেকেই দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় পুরো বাংলা স্বাধীন হয়ে যায়।

বাংলার স্বাধীনতা টিকেছিল ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ দুইশত বছর। বাংলার স্বাধীন এই দুইশত বছরের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সুলতানি বংশ শাসন করেছিল। যার একটি ইলিয়াস শাহী এবং অন্যটি হোসেন শাহী বংশ নামে সুপরিচিত। হোসেন শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। ১৫২৬ সালে দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে। তখন দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতে মোগল শাসন শুরু হয়। তারাও বাংলা দখলের চেষ্টা করেছিল। তারা প্রথমে সফল হয়নি।

বিহার অঞ্চলে তখন আফগানদের জমিদারি ছিল। তাদের বিখ্যাত নেতা ছিলেন শেরখান শূর। তিনি শেরশাহ নামে দিল্লির সিংহাসনেও বসেছিলেন। তার মাধ্যমেই বাংলায় শুরু হয়েছিল আফগান শাসন। মোগল সম্রাট আকবরও আমাদের এই দেশ দখল করতে পারেন নি। বাংলার বড়ো বড়ো জমিদারদের তখন বলা হতো বারো ভূঁইয়া। তারা একজোট হয়ে মোগলদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি ইসলাম খান চিশতি বাংলা অধিকার করেন। তখন স্বাধীনতা হারিয়ে মোগলদের অধীনে একটি সুবা তথা প্রদেশে পরিণত হয় বাংলা। এই শাসন চলেছিল ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

কাজ: মুসলিম শাসনামলে বাংলার শাসকদের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৮: ঔপনিবেশিক যুগের বাংলা

বাংলায় মধ্যযুগের পরবর্তী সময়কাল ঔপনিবেশিক যুগ হিসেবে পরিচিত। উপনিবেশবাদী ব্রিটিশরা এই সময় বাংলার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল বলে এই সময়কালকে বলা হয় ঔপনিবেশিক শাসন। শুরুতে ১৭৫৭ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নানাভাবে বাংলাকে শোষণ করে। তারপর ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয় সিপাহী বিপ্লব। এরপর সরাসরি রানীর শাসনের অধীনে চলে গিয়েছিল বাংলা। পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) দীর্ঘ সময়কালকে ঔপনিবেশিক শাসন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ পরাজিত হলে বাংলার নামমাত্র নবাব হন বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলি খান। তারপর তারা ক্ষমতায় বসায় মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমকে। শুরুতে ব্রিটিশদের আজ্ঞাবহ থাকলেও পরে বিদ্রোহ করে বসেন মীর কাসিম। তিনি বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বাংলা পুরোপুরি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

শুধু বাংলা নয়, এরপর পুরো ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন চলেছিল ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুইশ বছর। প্রথম দিকে ভারত শাসন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া। রানির পক্ষ থেকে ইংরেজ শাসকরা ভারত উপমহাদেশ শাসন করতেন। তাদের অপশাসনকে মেনে নিতে পারেনি বাংলার মানুষ। তারা বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সিপাহী বিপ্লব, তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন, নীল বিদ্রোহসহ অনেকগুলো আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। শেষ অবধি শুরু হয় বিখ্যাত 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ইংরেজরা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এর ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পাকিস্তান ছিল দুটি ভিন্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত। ভৌগোলিকভাবে অনেক দূর অবস্থিত দুটি ভূখণ্ডের পশ্চিম অংশটিকে বলা হতো পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব অংশটিকে বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান। তৎকালীন দুই ভূখণ্ডে বিভক্ত পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। তারাও নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে শোষণ করত। একটা পর্যায়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে একত্রিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বুঝতে পারে পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের আধিপত্য আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে গণহত্যা শুরু করে। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। ২৬শে মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ জন্ম নেয় নতুন দেশ, বাংলাদেশ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **কোন তারিখে বিজয়দিবস পালিত হয়?**

ক. ২১শে ফেব্রুয়ারি　　গ. ১৭ই এপ্রিল

খ. ২৬শে মার্চ　　ঘ. ১৬ই ডিসেম্বর

২. **প্রাচীন বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের কারণ কী?**

ক. অত্যন্ত কর্মঠ জনগণ　　গ. অধিক উৎপাদনশীল কৃষি ও শিল্প

খ. উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা　　ঘ. অত্যাধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

তথ্য -১ :	**নরসিংদীতে মাটি খনন করে পাথর ও কাঠের তৈরি হাত কুঠার, বাটালি, তীরের ফলা পাওয়া গেছে।**
তথ্য -২ :	**ঢাকার একটি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সভ্যতার নিদর্শন দেখার জন্য বগুড়া ও নরসিংদীতে শিক্ষা সফরে যায়।**

৩. **তথ্য -১ কোন যুগকে নির্দেশ করে?**

ক. মধ্যযুগ　　গ. তাম্র প্রস্তর যুগ

খ. আধুনিক যুগ　　ঘ. প্রাগৈতিহাসিক যুগ

৪. **তথ্য-১ ও ২ এর স্থানে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ করবে-**

i. পুণ্ড্রনগরের লিপি

ii. নানারকম প্রাচীন হাতিয়ার

iii. বিদেশে রপ্তানিকৃত শস্যভাণ্ডার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   গ. ii ও iii

খ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

তথ্য -১	তথ্য - ২
প্রধান ফসল ধান। প্রচুর ধান উৎপাদন। রপ্তানিকৃত দ্রব্য চিংড়ি ও ব্যাঙ।	আকাশপথে আমেরিকায় তৈরি পোশাক রপ্তানি। পাটজাত দ্রব্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

ক. কোন সম্রাট ৫০টি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন?

খ. 'টোল' বলতে কী বোঝায়?

গ. তথ্য-১ এর মতো প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরবময় ক্ষেত্রটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তথ্য-২ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রাচীন বাংলাদেশের গৌরবের সাথে সাদৃশ্যপুর্ণ-মতামত দাও।

২. আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা চলে এসেছে। গুপ্তযুগ ও পাল রাজবংশের শাসনকালে শিল্পকলা, স্থাপত্য, চিত্রশিল্পে সমৃদ্ধ হয়েছিল বাংলা। বাংলাদেশের কুমিল্লা ও নওগাঁ জেলায় এ ধরনের শিল্প ও সংস্কৃতির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

ক. মাৎস্যন্যায় কী?

খ. সমতট অঞ্চল বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জেলায় কোন যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়? বর্ণনা কর।

ঘ. দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলের মহাবিহারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সমাজ

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে। এক টুকরো পাথর বা একটি গাছের ডাল হয়ে উঠেছিল হিংস্র পশুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর হাতিয়ার। প্রকৃতিকে এমনিভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছে সংস্কৃতি যা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। মানুষ বুঝতে পারল সমাজবদ্ধ হয়ে একত্রে থাকলে টিকে থাকার এই লড়াই আরও সুদৃঢ় হবে। তাই সমাজকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয় নানা নিয়ম-কানুন, যা ধীরে ধীরে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদিতে রূপ নিল। সমাজের মানুষের আনন্দ, বিনোদন ও কল্যাণের জন্য তৈরি হলো নাচ, গান, সাহিত্য আরও কত কী! ফলে রচিত হলো সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত রূপ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- সংস্কৃতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করতে পারব।

পাঠ- ১ : সংস্কৃতির ধারণা

সংস্কৃতি আসলে মানুষের জীবনধারা। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সমাজজীবনে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যা কিছু চিন্তা ও কর্ম করে তা-ই তার সংস্কৃতি। যেমন- বেঁচে থাকার জন্য মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে। সেই খাদ্যকে যখন বিভিন্ন প্রণালিতে রান্না করে এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করে তখন সেটা হয়ে যায় মানুষের সংস্কৃতি। মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন প্রথম পাথরে খোদাই করে কিংবা গাছের ছাল বা পাতায় লিখত। তারপর যখন কাগজ আবিষ্কার করল তখন কালিতে পাখির পালক ডুবিয়ে লিখত। ধীরে ধীরে মানুষ কলম তৈরি করে কাগজের উপর লিখল।

এরপর মানুষ টাইপ রাইটার আবিষ্কার করে তার মাধ্যমে লেখা শুরু করল এবং সর্বশেষ মানুষ কম্পিউটার আবিষ্কার করল। এখন পৃথিবীর বহু মানুষই কম্পিউটার লেখে। এই যে লেখার বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষ তৈরি করল এর সমষ্টিও সংস্কৃতির একটি অংশ।

কাজ : "আমাদের জীবনযাত্রার ধরনই হলো আমাদের সংস্কৃতি" - ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ২ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান

বাংলাদেশের সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান আমরা খালি চোখে দেখতে পারি, ধরতে পারি। আবার এ দেশের সংস্কৃতির অনেক উপাদানই আমরা দেখতে পাই না, ধরতেও পারি না। যেমন- বাংলাদেশের মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি আমরা দেখতে পাই; কিন্তু এগুলো তৈরির জ্ঞান ও কৌশল দেখা যায় না। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানসমূহকেও দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) বস্তুগত বা দৃশ্যমান উপাদানসমূহ ও (২) অবস্তুগত বা অদৃশ্যমান উপাদানসমূহ।

এ দেশের সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে- বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক, যানবাহন, খাবার, চাষাবাদের উপকরণ, বইপত্র ইত্যাদি।

আমাদের সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহ হচ্ছে- সামগ্রিক জ্ঞান, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ, ভাষা, বর্ণমালা, শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত, আদর্শ ও মূল্যবোধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি।

আমাদের দেশের মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনেই বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদানসমূহ সৃষ্টি করেছে। এসব উপাদান শত শত বছর ধরে টিকে থাকতে পারে। যেমন- আমরা জাদুঘরে গেলে এমন অনেক জিনিস দেখতে পাই, যেগুলো শত বছরের পুরানো। সেগুলো দেখে আমরা বাংলাদেশের সে সময়ের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহ কোনোভাবেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কেননা, সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- নকশিকাঁথা বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি বস্তুগত উপাদান। এর মধ্যে যখন ফুল-পাতা, হাতি-ঘোড়া বা অন্য কোনো দৃশ্য সেলাই করা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে এদেশের নারী মনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদানগুলোর একটির পরিবর্তনে অন্যগুলোরও পরিবর্তন হয়। যেমন- বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে শাড়ি একটি উপাদান। প্রযুক্তির পরিবর্তনে শাড়ির রং ও ডিজাইনে পরিবর্তন এসেছে। শাড়ি পরার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে।

কাজ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন

সংস্কৃতি নির্মাণে ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলে একেক দেশের মানুষের সংস্কৃতি একেক রকম। আবার একটি দেশের মধ্যেও নানা ধরনের সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারে। তাই সংস্কৃতি কোনো স্থবির বিষয় নয়, বরং পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতির সবটাই বদলে যায় তা কিন্তু নয়। সংস্কৃতির কিছু প্রধান দিক দীর্ঘসময় অপরিবর্তনীয় থেকে যায়।

পেশা, লিঙ্গ, বয়স, স্থান, উৎপাদন পদ্ধতি, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি দেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির চর্চা হতে পারে। যেমন, গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শহুরে সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গ্রামের ভৌগোলিক পরিবেশে থাকে পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ ইত্যাদি। কৃষি, মৎস্যচাষ, নৌকাচালানো ইত্যাদি পেশা গ্রামের সংস্কৃতি নির্মাণে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য ভাত-মাছ এখনও গ্রামের খাদ্যাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জারি, সারি, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বারমাস্যা, গম্ভীরা ইত্যাদি নানা আঞ্চলিক গানে ফুটে ওঠে গ্রামের মানুষের হাসি-কান্না। গ্রামের মেলায় ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালাগান, যাত্রাগান, কবিগান, কীর্তনগান, মুর্শিদি গান প্রভৃতির আয়োজন আধুনিক কালেও গ্রামের অনন্যতা বজায় রেখেছে। অন্যদিকে শহরের ভৌগোলিক পরিবেশ, পেশা, যান্ত্রিক জীবন ইত্যাদি গড়ে তুলেছে শহুরে সংস্কৃতি। বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির পাশাপাশি এখানে প্রবেশ করেছে আধুনিক দালান কোঠা ও প্রচুর যান্ত্রিক গাড়ি। বিশ্বায়নের প্রভাব শহরে বেশি।

একইভাবে বিভিন্ন পেশার মানুষ গড়ে তোলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারা। উৎসব-পার্বণ পালনে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নারী-পুরুষের পোশাক, জীবনাচার, চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।

আদিকাল থেকেই বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের ভাষিক সংস্কৃতি। অস্ট্রো-এশীয়, দ্রাবিড়ীয়, তিব্বতি-বর্মী, ইন্দো-ইউরোপিয়ান ইত্যাদি নানা ভাষা পরিবার মিলে তৈরি হয়েছে আমাদের ভাষারীতি। পরবর্তীকালে ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকেও আমাদের ভাষা গ্রহণ করেছে অনেক শব্দ ও রীতি।

সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের সংস্কৃতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানবতাবাদী- যা আমরা পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছি। নানাভাবে এর প্রমাণ আমরা পাই। চৈত্রসংক্রান্তি মেলা যেমন আমাদের চিরায়ত কৃষিসংস্কৃতির পরিচায়ক, একইভাবে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন উৎসব যেমন- গারোদের ওয়ানগালা,

সাঁওতালদের সোহরাই আমাদের কৃষি সংস্কৃতির সমান অংশীদার। মণিপুরি নৃত্য, উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঝুমুর নৃত্য, ত্রিপুরাদের বোতল নৃত্য ইত্যাদি বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও ঝুমুর তালে লিখেছেন অনেক গান।

সুতরাং প্রতিনিয়ত অন্য সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে চর্চা করব এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

কাজ : দলে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধরন চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি বস্তুগত সংস্কৃতি?

ক. তৈজসপত্র
খ. নৃত্যকলা
গ. আচার-অনুষ্ঠান
ঘ. সাহিত্য

২. বাংলাদেশের সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময় কারণ-

i. ধর্মের ভিন্নতা
ii. পেশার ভিন্নতা
iii. ভৌগোলিক পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের দৃশ্যকল্প দেখে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

	ছোটোদের, বড়োদের, সকলের গরিবের, নিঃস্বের, ফকিরের আমারই দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের
দৃশ্যকল্প- ১	দৃশ্যকল্প- ২

২০১৫

৩. দৃশ্যকল্প -২ এর মাধ্যমে সংস্কৃতির কোন দিকটি ফুটে উঠেছে ?

ক. মানবতাবাদ গ. সাম্প্রদায়িকতা

খ. ধর্ম বিশ্বাস ঘ. বর্ণবাদ

৪. দৃশ্যকল্প ১ ও ২ হলো-

i) মানুষের চিন্তার বহি:প্রকাশ
ii) একটির সাথে অপরটি সম্পর্কযুক্ত
iii) উভয়েই সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হাজেরা বাবার সাথে গ্রামে বেড়াতে যায়। তার ফুফাতো বোন জুলেখার পছন্দ সকালে পান্তাভাত ও মাছ দিয়ে নাস্তা করা ও ভাটিয়ালি গান শোনা। নাস্তায় মাছ-ভাত খেতে দিলে হাজেরার মন খারাপ হয়। কারণ তার পছন্দ বার্গার, পরোটা মাংস। পড়াশোনা শেষে তার সময় কাটে ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

ক. সংস্কৃতি কী?

খ. সংস্কৃতি উপাদানকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?

গ. জুলেখার মাধ্যমে বাংলাদেশের কোন সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাজেরার সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব লক্ষ করা যায় মতামত দাও।

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষির পাশাপাশি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছে। দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিছু শিল্প কারখানা, রেল ও সড়ক ব্যবস্থা প্রভৃতি রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্প বিকাশ লাভ করেছে, যা অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনে অসমতা না ঘুচলেও তাদের জীবনেও কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া কোনো দেশ ও জাতি টিকে থাকতে পারে না। দেশ থেকে বেকারত্ব, দারিদ্র্য দূর করতে পারলে দেশের জনগণও উন্নত জীবনযাপন করতে পারবে। এই অধ্যায়ের পাঠগুলোতে আমরা সেই বিষয়ে জানতে পারব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক জীবনধারা বর্ণনা করতে পারব;
- গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক কাজ বর্ণনা করতে পারব;
- শহর ও গ্রামের অর্থনীতির তুলনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতের বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা কীভাবে সম্পদ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে সচেতন হব এবং নিজেকে দক্ষ সম্পদে পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ- ১ ও ২: অর্থনৈতিক জীবনধারা

কোনো সমাজ বা জনগোষ্ঠী সাধারণত যে ধরনের অর্থনৈতিক কাজ করে জীবনধারণ করে তাকেই ঐ সমাজ বা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনধারা বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। জমিতে চাষ করে তারা শস্য উৎপাদন করে। তা দিয়ে নিজেদের খাদ্যের চাহিদা মেটায়। উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ তারা বাজারে বিক্রি করে সেই অর্থে সংসারের অন্যান্য প্রয়োজন মেটায়। বাড়তি শস্য উৎপাদন করে তারা দেশবাসীর খাদ্যের জোগান দেয়। এভাবে তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। একইভাবে শহরাঞ্চলের শ্রমিক, শিল্পপতি, চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক জীবনধারাও শিল্প কিংবা ব্যবসাকেন্দ্রিক।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। এমনকি যাদের নিজস্ব জমি নেই তারাও অন্যের জমিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ দেশের কয়েক কোটি মানুষ তাদের জীবিকার জন্য সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। সে কারণে বাংলাদেশকে কৃষিনির্ভর দেশ বলা হয়।

কৃষিকাজ ছাড়াও গ্রামের মানুষের একটা অংশ জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতার, মুদি হিসেবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। কিছু কিছু লোক গ্রামের হাট-বাজার বা কাছাকাছি শহরে-গঞ্জে ছোটোখাটো ব্যবসা করে। এদের সবাইকে নিয়েই বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রয়েছে।

কুমার মাটির পাতিল তৈরি করছে

বর্তমানে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং সার, কীটনাশক ও উচ্চফলনশীল বীজের প্রয়োগ হচ্ছে। এর ফলে ফসলের উৎপাদনই শুধু বাড়েনি, গ্রামীণ অর্থনীতির জন্যও তা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। সাথে তৈরি করেছে পরিবেশ ঝুঁকি, গ্রামের মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ সামগ্রিক জীবনযাত্রার উপর এর প্রভাব পড়েছে।

জেলে জাল দিয়ে মাছ ধরছে

তাঁতি কাপড় বুনছে

গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্ব

আমাদের দেশের মোট খাদ্য চাহিদার বড়ো অংশ আসে কৃষি থেকে। আর গ্রামের মানুষই এর উৎপাদক। দেশে শিল্পের কাঁচামালের অন্যতম উৎসও হচ্ছে গ্রামীণ কৃষিখাত। অর্থাৎ দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও জনগণের কর্মসংস্থানের বিষয়টি অনেকাংশে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি এখনও আমাদের জাতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

গ্রামের একটি হাট

বাংলাদেশের শহুরে অর্থনীতি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ শতাংশ শহরাঞ্চলে বাস করে। রাজধানী ঢাকা, বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, শিল্প শহর নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় বাস করে বিপুল সংখ্যক মানুষ। এসব শহর ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শহরে বসবাসকারী মানুষ সাধারণত অফিস-আদালত ও শিল্প-কারখানায় চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন চালনা, নানা ধরনের দিনমজুরি ও বাসাবাড়িতে সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা ধনী তারা নগরীর অভিজাত এলাকায় বাস করে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজস্ব

বা ভাড়া বাসায় থাকে। এছাড়া বিশালসংখ্যক মানুষ বস্তি এলাকায় বাস করে। বড় বড় শহরগুলোতে ভাসমান মানুষের সংখ্যাও কম নয়। তারা অস্থায়ীভাবে ফুটপাত, পার্ক, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট ইত্যাদিতে রাত কাটায়। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকেও কোনো না কোনো জীবিকা অবলম্বন করতে হয়। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমিক, দিনমজুর, বস্তিবাসী সবাই মিলেই শহরের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখে।

শহরের গার্মেন্টস কারখানা

শহুরে অর্থনীতির গুরুত্ব

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে আজ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের মানুষের জীবনধারার পার্থক্য কিছুটা কমে আসছে। বাড়ছে গ্রাম ও শহরের একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা। লেখাপড়া, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা, ইত্যাদির জন্য গ্রামের মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি শহরের উপর নির্ভরশীল। নগর জীবনের বিস্তার, শিল্পায়ন ও কাজের খোঁজে গ্রাম থেকে প্রতিদিন বহুলোক শহরে আসে। তাছাড়া উঠতি বড়লোকরা সবাই শহরেই থাকে ফলে মোট উৎপাদনে শহুরে অর্থনীতির ভূমিকা অনেক। ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শহুরে জনগণের ভূমিকা দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কাজ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক কাজের গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

পাঠ- ৩ : বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের অর্থনীতিরও প্রধান খাতগুলো হলো কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবাখাত। তবে এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ একটা বড়ো ভূমিকা রাখে।

ক. কৃষি: প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের অর্থনীতিতে কৃষি মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানেও এদেশের বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। ধান, পাট, চা, ডাল, রবিশস্য, শাকসবজি ও ফলমুল উৎপাদন; বনজ সম্পদ, পশুপালন ও মৎস্যচাষকে কৃষিখাতের মধ্যে ধরা হয়। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান প্রায় ২০ শতাংশ।

খ. শিল্প: কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রী, বিদ্যুৎ, গ্যাস, খনিজসম্পদ, দালানকোঠা বা অবকাঠামো নির্মাণ এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্পসামগ্রী হলো পাট ও চামড়াজাত দ্রব্য, সুতা ও কাপড়। এছাড়া রয়েছে কাগজের কল, তৈরি পোশাক শিল্প, আসবাবপত্র তৈরির কারখানা, চিনি কল ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যশিল্প, পেট্রোল ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শিল্প, ঔষধ শিল্প ইত্যাদি।

গ. ব্যবসা-বাণিজ্য: অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যও আমাদের অর্থনীতির একটি প্রধান খাত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে দেশের ভিতরে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে জিনিসপত্র কেনাবেচাকে বোঝায়। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে এই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে আমরা যেমন কিছু পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করি, তেমনি যেসব পণ্য আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় তার একটি অংশ বিদেশে রপ্তানিও করি। এভাবে রপ্তানিকৃত পণ্য থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

ঘ. সেবাখাত: যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে সেবাখাত একটি বড়ো ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংক-বিমা, জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এগুলো হলো সেবাখাতের উদাহরণ। সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগেই এই খাতটি পরিচালিত হয়। যে দেশ যত উন্নত এবং জনগণের কল্যাণকে যত বেশি গুরুত্ব দেয়, সেখানে এই সেবাখাতটি ততই শক্তিশালী।

ঙ. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ বিরাট ভূমিকা রাখে। তবে তাদের জন্য সরকারী সুযোগ-সুবিধা ততটা না থাকলেও তারা দেশের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। আধুনিক রাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও সেবা এই খাতগুলোর কোনোটির গুরুত্ব অ অন্যটির চেয়ে চেয়ে কম নয়। কৃষিখাত দেশের মানুষের খাদ্য-চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে। শিল্পখাত খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, আবাসন প্রভৃতির চাহিদা মেটানো ছাড়াও নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যবসা খাত অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য-সামগ্রীকে সহজলভ্য করার পাশাপাশি বিদেশ থেকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। সেবাখাত দেশের মানুষের জীবনমানের উন্নতির জন্য কাজ করে।

কাজ - ১ : বাংলাদেশের সেবাখাতের একটি তালিকা তৈরি কর।
কাজ - ২ : দলে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের গুরুত্ব তুলে ধর।

পাঠ-৪ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। স্বাধীনতার পর অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছি। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেরও উন্নয়নের পথে কতগুলো বাধা বা সমস্যা রয়েছে। যেমন- সুশাসন ও গণতন্ত্রের অভাব, দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব। অন্যদিকে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের চমৎকার সম্ভাবনাও আছে। যার মধ্যে প্রধান হলো আমাদের বিরাট জনশক্তি ও উর্বর ভূমি। আমাদের সমস্যাগুলোকে ঠিকভাবে চিনে তা সমাধান করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের সম্ভাবনাগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। আমরা অনেক ভাগ্যবান যে আমাদের মাটি, পানি ও বিরাট জনশক্তি উন্নয়নের পথে একটি বড়ো সহায়। আমাদের দেশের মানুষ পরিশ্রমী। আমাদের দেশের প্রবাসী শ্রমিকেরা বিদেশের মাটিতে তার প্রমাণ দিচ্ছে। গার্মেন্টস বা পোশাক-শিল্পে বাংলাদেশ যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তাও উন্নয়নের পথে আমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে তুলে ধরছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ

ক. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হলে তার জন্য দরকার শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। বিশাল জনসংখ্যার দেশ আমাদের বাংলাদেশ। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের শিক্ষার হার কম। শিক্ষায় সরকারের বরাদ্দও অপ্রতুল। শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের অনেক মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। দেশের মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমরা তাদের জীবনমান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে পারি। সেই সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের বিরাট জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারি।

খ. কৃষির উন্নতি

গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে কৃষি এখনও উন্নয়নের প্রধান খাত। আধুনিক যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ও কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার, প্রাকৃতিক কৃষি এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের দ্বারা আমরা আমাদের কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াতে পারি। এতে আমাদের গ্রামের মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে, পরিবেশ দূষণ কমবে ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

গ. প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

গ্যাস, তেল প্রভৃতি যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও অব্যবহৃত রয়েছে সেগুলো মধ্যে পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বিকল্পভাবে সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। কয়লা উত্তোলন করে বায়ু ও সৌরশক্তি কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিল্প না টেকসই উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে যা আগামীর জন্য দরকারী।

ঘ. শিল্পের প্রসার

গার্মেন্টস, ঔষধ, সিমেন্ট, সিরামিকসহ দেশের সম্ভাবনাময় শিল্পখাতকে সম্প্রসারণ করতে হবে। যাতে দেশের চাহিদা মিটিয়ে এসব পণ্য আমরা আরও অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করতে পারি। তাতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ বাড়বে ও অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

ঙ. অবকাঠামো নির্মাণ

সড়ক, সেতু, রেলপথ এবং পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি বা সম্প্রসারণ করতে হবে। তা না হলে শিল্প বা কৃষি, বাণিজ্য বা সেবা কোনো ক্ষেত্রেই একটি দেশ উন্নতি করতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্ত হিসেবে এই অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিকে তাই আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। তবে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির কথা মাথায় রেখে অবকাঠামো নির্মাণের পন্থা বের করতে বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে হবে।

চ. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার হবে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। যারা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ও যারা তা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন তাদের সবাইকে এ ব্যাপারে দেশের স্বার্থ ও প্রকৃতির সুরক্ষার কথাকেই সবার উপরে স্থান দিতে হবে।

কাজঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।

পাঠ-৫: দক্ষ জনশক্তি তৈরি

মানবসম্পদ

অদক্ষ মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজের কোনো কাজে আসে না। অন্যদিকে দক্ষ মানুষ যেমন ব্যক্তিগতভাবে সফল হয়, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকেও গতিশীল করতে পারে। দক্ষ মানুষ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে অদক্ষ মানুষ গণ্য হয় রাষ্ট্রের বোঝা হিসেবে। দক্ষ মানুষকেই মানবসম্পদ বলা হয়। যেমন- বিশ্বব্যাংকের তথ্য (২০২৩) মতে চীন দেশে ১৪১ কোটি ৭ লক্ষ ১০ হাজার মানুষ বাস করে। যাদের প্রত্যেকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে চীনের প্রতিটি মানুষ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে। চীনারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় চীনের অর্থনীতি দ্রুত উন্নতি লাভ করছে।

জনসমষ্টিকে মানবসম্পদে পরিণত করার উপায়

মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করার উপায়গুলো নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান,

খ. উন্নত স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান,

গ. ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি,

ঘ. উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা,

ঙ. প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগে সহায়তাদান,

চ. পেশাগত প্রশিক্ষণ দান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান,

ছ. উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান,

জ. উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে মূলধন খাটানোর কৌশল শিক্ষাদান।

রাষ্ট্র যদি তার জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার দর্শন গ্রহণ করাতে পারে তাহলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা করা সম্ভব। ফলে দেশের শতভাগ মানুষ দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পাবে। আর শতভাগ দক্ষ জনশক্তি নিয়ে কোনো দেশ দরিদ্র থাকতে পারে না। সেই দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে শিল্পের কাঁচামালের অন্যতম উৎস কোনটি?

ক. কৃষিখাত　　গ. আমদানিখাত

খ. শিল্পখাত　　ঘ. সেবাখাত

২. শহরের অর্থনীতিকে সচল রাখে -

i. ধনী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী

ii. চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত ও পেশাজীবী

iii. নিম্নবিত্ত, শ্রমিক ও দিনমজুর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　　গ. i ও iii

খ. i ও ii　　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কুমিল্লার সবজি চাষি ওসমান মোল্লা তার উৎপাদিত কাঁচা সবজি গ্রামেই বিক্রি করত। গ্রামে তেমন চাহিদা না থাকায় কমদামে বিক্রি করতে হতো। মেঘনা সেতু নির্মাণের পর এখন প্রায় সে প্রতিদিন ঢাকায় এসে সবজি বিক্রি করায় তার আয় তিনগুণ বেড়ে যায়।

৩. ওসমান মোল্লার আয় বৃদ্ধির মূল কারণ কী-

ক. অবকাঠামোগত নির্মাণ　　　গ. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

খ. কৃষির আধুনিকীকরণ　　　ঘ. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৪. উক্ত নির্মাণের ফলে সংগঠিত হচ্ছে-

i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ii. শিল্পের প্রসার

iii. বাজার সম্প্রসারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　　গ. i ও iii

খ. ii ও iii　　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আশরাফ আলী তার কারখানায় পশুর চামড়া দিয়ে ব্যাগ তৈরি করেন। প্রথম বছরে ইংল্যান্ডে তার তৈরি ব্যাগ স্বল্প পরিমাণে বিক্রি হলেও তিন বছর শেষে ইউরোপের কয়েকটি দেশে তার পণ্যের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে তার স্ত্রী মিসেস জমিলা প্রতিদিন বাড়ির আঙ্গিনার হাঁস ও মুরগির খামার থেকে প্রায় শতাধিক ডিম বাজারে বিক্রি করেন। দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের সুখের সংসার।

ক. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ শহরাঞ্চলে বাস করে?

খ. বাংলাদেশকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয় কেন?

গ. মিসেস জমিলার কাজটি অর্থনীতির কোন খাতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আশরাফ আলী ও মিসেস জমিলার কাজের মধ্যে কোনটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক সহায়ক বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. মধ্যবিত্ত লোকমান সাহেবের চার ছেলের সবাই বেকার। বড়ো ছেলে আরমানকে ধার দেনা করে সৌদি আরব পাঠানোর পর সে একটি খেজুর বাগানে কাজ পেল। সেখানে মরুভূমির অনুর্বর জমিতে মেধা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে খেজুরসহ বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ দেখে সে অনুপ্রাণিত হয়। নিজ দেশের অনুন্নত কৃষির কথা চিন্তা করে পরের বছরই সে দেশে ফিরে এসে তিন ভাইকে নিয়ে খামার করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেকার তিন ভাইকে হর্টিকালচার সেন্টার থেকে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দিয়ে চার ভাই একত্রে একটি খামার তৈরি করে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

ক. আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান কত শতাংশ?

খ. সেবাখাত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব আরমান সৌদি আরব থেকে ফিরে কোন অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ ''জনাব লোকমানের বেকার চার পুত্রই এখন মানবসম্পদ'' -মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক

মানুষ অনেক আগে জন্ম নিলেও প্রাচীন পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না কোনো নাগরিকত্বের ধারণা। সময়ের পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর আগে নদী ও সমুদ্রের তীরে প্রাচীন কিছু নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠে। নগররাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে। ধীরে ধীরে আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় আট শ'কোটি। এ বিপুল জনসংখ্যার সবাই কোনো না কোনো রাষ্ট্রের অধিবাসী বা নাগরিক। যেমন, আমরা সবাই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং নাগরিক। রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়, কীভাবে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়, নাগরিক বলতে কী বোঝায়, কীভাবে একটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করা যায়-এ অধ্যায় পাঠে এ সম্পর্কে আমরা জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশ কেন একটি রাষ্ট্র তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব;
- বিভিন্ন দেশের নাগরিকতা অর্জন পদ্ধতির তুলনা করতে পারব;
- দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দেশের উন্নয়নে নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করব।

পাঠ-১ : রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্র হলো এমন একটি সংগঠন যার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। তাহলে বলা যায়, রাষ্ট্র গঠনে চারটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। যে কোনো একটি উপাদানের অভাবে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

১. জনসমষ্টি : রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হলো জনসমষ্টি। জনগণ হলো রাষ্ট্রের প্রাণ। জনসমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। তবে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কমও হতে পারে আবার বেশিও হতে পারে। যেমন- চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি ৭ লক্ষ ১০ হাজার। অন্যদিকে 'সান ম্যারিনা' নামের একটি ছোটো দেশের জনসংখ্যা ৩৩ হাজার ৮শত ৬০ মাত্র।
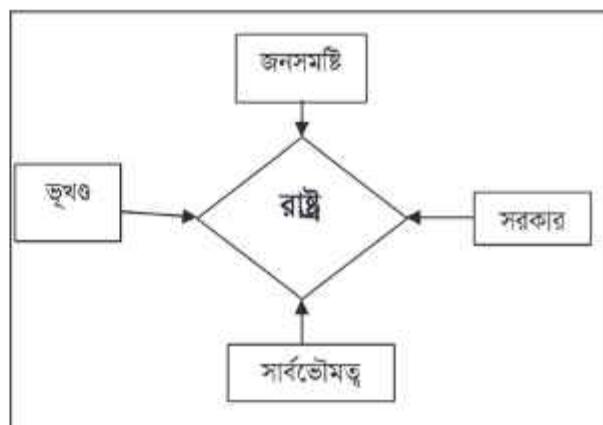
২. **ভূখণ্ড:** রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। ভূখণ্ড বলতে জল, স্থল ও তার উপরিস্থিত আকাশসীমাকে বোঝায়। তবে ভূখণ্ডের আয়তন কতটুকু হবে তার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আয়তনে অনেক বড়ো হতে পারে। আবার অনেক ছোটোও হতে পারে। যেমন- ভারতের আয়তন প্রায় ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গকিলোমিটার। অন্যদিকে সিঙ্গাপুর ও ভ্যাটিকান সিটির আয়তন যথাক্রমে প্রায় ৬৯৩ বর্গকিলোমিটার ও ০.১৮ বর্গকিলোমিটার। সিঙ্গাপুর ও ভ্যাটিকান নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্র।

৩. **সরকার:** রাষ্ট্র গঠনের আরেকটি অন্যতম উপাদান হলো সরকার। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করে এবং আইন অনুযায়ী জনগণকে পরিচালনা করে। জনগণ সরকারের সকল বৈধ আদেশ মেনে চলে এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

৪. **সার্বভৌমত্ব:** রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। এ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরে যে কাউকে যেকোনো নির্দেশ দিতে পারে। তাকে সে আদেশ পালনে বাধ্য করতে পারে। সার্বভৌমত্বের কারণে রাষ্ট্র অন্য কোনো দেশ বা শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে।

কাজ : ঢাকা ও লন্ডনকে রাষ্ট্র বলা যাবে কি না সহপাঠীদের সঙ্গে দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

পাঠ-২: রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একটি রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যেসব উপাদান দরকার তার সবগুলোই বাংলাদেশের রয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উপাদানগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা জেনে নিই।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী

জনগোষ্ঠী: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিশাল। এর সংখ্যা বর্তমানে ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯শ ১১জন (২০২২ এর আদমশুমারি অনুযায়ী) বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ। জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ শিশু। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনবহুল রাষ্ট্র।

ভূখণ্ড: বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে আমরা এ ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছি। উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ভারত ও মিয়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূখণ্ড বিস্তৃত। অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বিল, পাহাড়-পর্বত, বনভূমি ও বিস্তৃত সমভূমি নিয়ে এ ভূখণ্ড গঠিত। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।
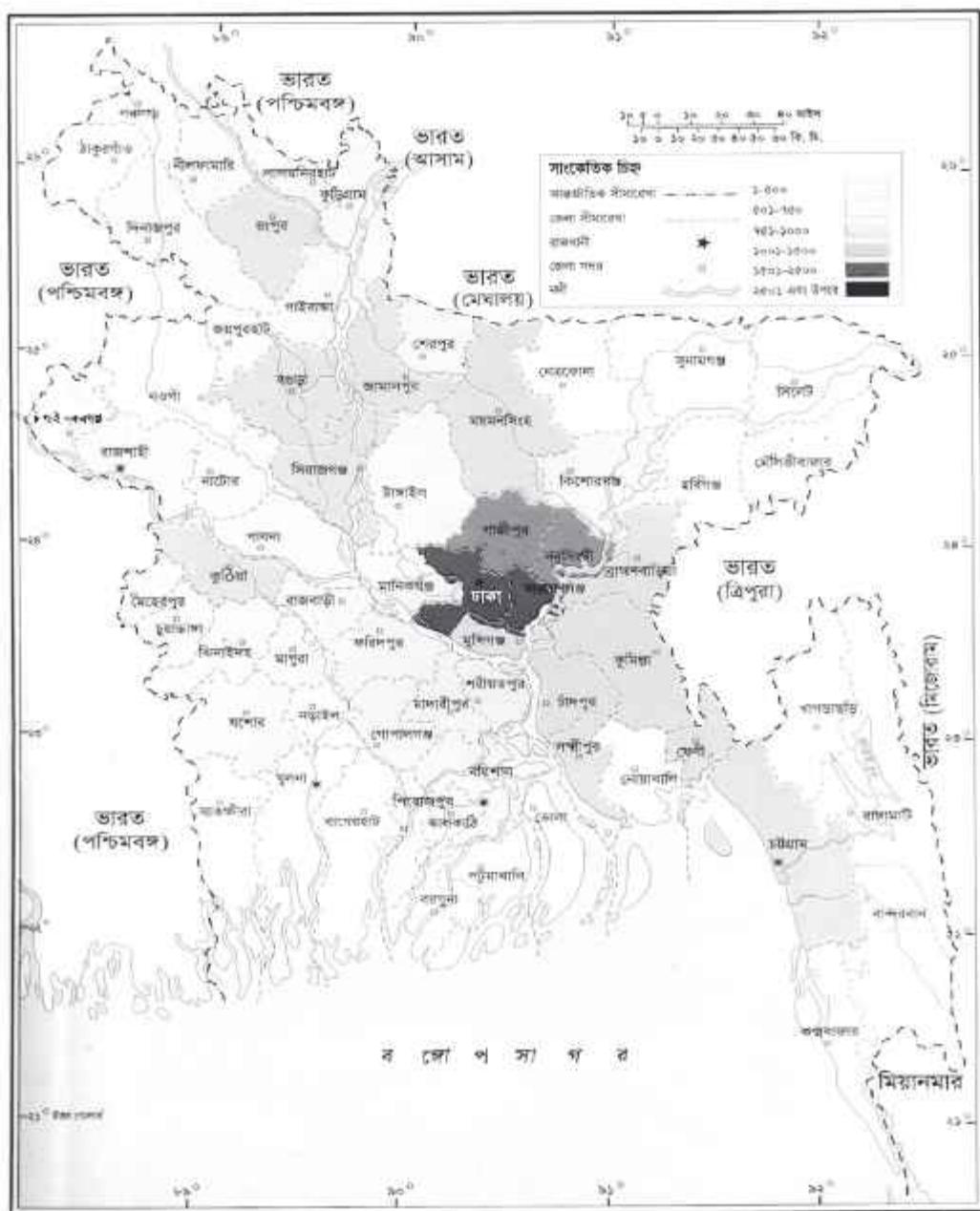
বাংলাদেশের মানচিত্র

সরকার: বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত। এর নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'। এটি একটি গণতান্ত্রিক সরকার। এ সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত। সরকারের সকল নিয়ম-কানুন ও আদেশ-নিষেধ জনগণ মেনে চলে।

সার্বভৌমত্ব: বাংলাদেশ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ ও অন্য দেশের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে দেশ শাসন করে। এ কারণেই অন্য কোনো দেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

উপরের আলোচনায় আমরা জেনেছি, রাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের রয়েছে। এর রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা, সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড, গণতান্ত্রিক সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা।

কাজ : দলে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী, ভূখণ্ড ও সরকার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর।

পাঠ-৩ : নাগরিক ও নাগরিকত্বের ধারণা

রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অধিবাসীকে বলা হয় নাগরিক। পূর্বে নগরে বসবাসকারীকে নাগরিক বলা হতো। তখন ছোটো ছোটো নগরকে কেন্দ্র করে গঠিত হতো রাষ্ট্র। এ নগররাষ্ট্রের অধিবাসীরাই নাগরিক বলে গণ্য হতেন।

কিন্তু বর্তমানে নাগরিক ও নাগরিকত্বের ধারণাও বদলে গেছে। এখন রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে যে কোনো ব্যক্তিই নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। নাগরিক রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হবে, রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবে, রাষ্ট্রের কল্যাণ চিন্তা করবে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের একদিকে যেমন রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অন্যদিকে তেমনি রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।
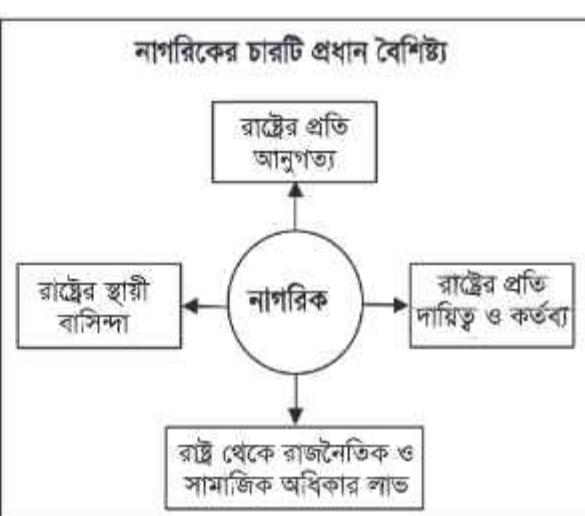
একজন নাগরিক রাষ্ট্রের পরিচয়েই নাগরিকত্ব পায়। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের নাগরিকত্বের পরিচয় বাংলাদেশি। আমাদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাই আমরা বাংলাদেশের নাগরিক।

নাগরিক ও বিদেশি

একটি রাষ্ট্রে নিজ দেশের অধিবাসী ছাড়া ভিন্ন দেশের অনেক লোকও বাস করে। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি নানা কারণে তারা অবস্থান করে। এরা বিদেশি হিসেবে পরিচিত। তবে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। বিদেশিরা যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে না। কেবল বসবাসকারী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সামাজিক অধিকার ভোগ করে, কিন্তু তারা বিদেশে বসবাসকারী দেশের সরকারের কিংবা রাষ্ট্রের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। তাই বিদেশিরা রাষ্ট্রের নাগরিক নয়।

কাজ : নাগরিক ও বিদেশির মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত কর।

পাঠ-৪ : নাগরিকত্ব লাভের নিয়ম

নাগরিকত্ব হলো রাষ্ট্রের অধিবাসী বা ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি এ পরিচয় লাভ করে। নাগরিকত্ব লাভের দুটি প্রধান উপায় হলো :

১. জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

২. অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

যারা জন্মসূত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে তারা জন্মসূত্রে নাগরিক। আর যারা আবেদনের মাধ্যমে কোনো দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে তারা অনুমোদনসূত্রে নাগরিক। তবে অনুমোদনসূত্রে যারা নাগরিকত্ব লাভ করে তাদেরকে রাষ্ট্রের আরোপিত কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো :

১. জন্মসূত্র নীতি ও ২. জন্মস্থান নীতি

জন্মসূত্র নীতি

এ নীতি অনুযায়ী মা-বাবা যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সন্তান সে রাষ্ট্রের নাগরিক হবে। কোনো মা-বাবার সন্তান বিদেশে জন্মগ্রহণ করলেও সে সন্তান মা-বাবার দেশের নাগরিক হবে। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ এ নীতি অনুসরণ করে থাকে। এ নীতি অনুযায়ী, কোনো জাপানি বা ফরাসি মা-বাবার সন্তান বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলেও তারা জাপান বা ফ্রান্সের নাগরিক হবে। এভাবে বাংলাদেশি বা

ভারতীয় কোনো মা-বাবার সন্তান ঐসব দেশে জন্মগ্রহণ করলে তারা বাংলাদেশ বা ভারতের নাগরিক হবে। বাংলাদেশ, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্র এ নীতি মেনে চলে।

জন্মস্থান নীতি

এ নীতি অনুযায়ী, মা-বাবা যে দেশেরই হোক না কেন সন্তান যে দেশে জন্মগ্রহণ করবে সন্তান সে দেশের নাগরিক হবে। এ নীতি জন্মস্থানের উপর নির্ভর করে। এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের মা-বাবার কোনো সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলে সে আমেরিকার নাগরিক হবে এবং সে দেশের নাগরিকত্ব লাভ করবে। শুধু তা-ই নয়, এ নীতি অনুসরণকারী দেশের জাহাজ বা দূতাবাসে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলেও সে সেই দেশের নাগরিক হবে। তবে বিশ্বের খুব কম সংখ্যক রাষ্ট্র এ নীতি অনুসরণ করে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

নাগরিকত্ব অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ

এ পদ্ধতিতে এক দেশের নাগরিককে অন্য দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। এখন এক রাষ্ট্রের নাগরিক সহজেই অন্য একটি বা একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হচ্ছে। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করার ফলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও নানা কারণে এক দেশের নাগরিককে অন্য দেশে বসবাস করতে হয়। এরূপ বসবাসকারী ব্যক্তির ঐ দেশের নাগরিকত্বের প্রয়োজন হয়। তখন রাষ্ট্রের কাছে ঐ ব্যক্তি আবেদন করে। আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাষ্ট্র শর্তসাপেক্ষে স্থায়ীভাবে নাগরিকত্ব প্রদান করে। নাগরিকত্ব লাভের পর ঐ ব্যক্তি সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভের কিছু শর্ত আছে। কোনো ব্যক্তি অনুমোদনসূত্রে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করবে যদি সে-

১. ঐ রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে বিয়ে করে,

২. ঐ রাষ্ট্রের সম্পত্তি ক্রয় করে,

৩. ঐ রাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে,

৪. ঐ রাষ্ট্রে চাকরিরত থাকে,

৫. ঐ রাষ্ট্রের ভাষা জানে,

৬. ঐ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করে,

৭. ভালো চরিত্রের অধিকারী হয়,

৮. উন্নততর দক্ষতার অধিকারী হয়,

৯. রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে।

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভকারী ব্যক্তি উল্লিখিত শর্তগুলোর এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করলে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। ঐ দেশের নাগরিকদের মতো প্রায় সমান অধিকারের সুযোগ-সুবিধা সে প্রাপ্য হবে।

দ্বৈত-নাগরিকত্ব

একই ব্যক্তি দুইটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করলে তাকে দ্বৈত-নাগরিকত্ব বলে। কোনো বাংলাদেশি মা-বাবার সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলে সে স্বাভাবিক নিয়মে ঐ দেশের নাগরিক হয়। অন্যদিকে মা-বাবা বাংলাদেশি হওয়ায় সে বাংলাদেশেরও নাগরিক। এ ক্ষেত্রে সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে ইচ্ছা করলে যেকোনো একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারে। তবে ইচ্ছা করলে সে দুটি রাষ্ট্রেরই নাগরিকত্ব রাখতে পারে।

কাজ : দলে ভাগ হয়ে নাগরিকত্ব লাভের নিয়মগুলো চিহ্নিত কর।

পাঠ-৫ : দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা

রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্র আছে বলেই সেখানে নাগরিক আছে। আবার নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আন্তরিক হলে সে সুনাগরিক বলে বিবেচিত হয়। তার দ্বারা দেশের অধিক উন্নয়ন সাধন হয়। একজন সুনাগরিক বুদ্ধিমান, বিবেকবান, আত্মসংযমী এবং নিবেদিত হয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে নানা অধিকার ভোগ করি। বিনিময়ে নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদেরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন- রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা লাভ, রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা, ভোট প্রদান করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা ও সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি। দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।

আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ ভোট দিয়ে একটি দলকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার গঠনে সহায়তা করে। সরকার যদি দেশের জন্য কল্যাণকর নয় এমন কোনো কাজ করে তাহলে জনগণই পরবর্তী সময়ে ঐ দলকে আর ভোট দেয় না। রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নসহ সবকিছুই তাই নির্ভর করে নাগরিকের সততা, দক্ষতা তথা নাগরিক হিসাবে যথাযথ ভূমিকা পালনের উপর। দেশের উন্নয়নের দায়িত্ব কেবল সরকারের একার নয়। নাগরিকদেরও নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তাহলেই দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

কাজ : নাগরিক হিসাবে তুমি দেশের উন্নয়নে কী ভূমিকা পালন করবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মূল অধিকারী কে?

ক. জনগণ গ. রাষ্ট্র

খ. সরকার ঘ. সমাজ

২. রাষ্ট্রের জন্য সরকারের অপরিহার্যতা –

i. দেশ পরিচালনায়

ii. জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায়

iii. দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii গ. ii ও iii

খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' রাষ্ট্রে নিজের দেশের নাগরিক ছাড়াও অন্যান্য দেশের লোক বাস করে। হঠাৎ 'খ' রাষ্ট্রের সাথে 'ক' রাষ্ট্রের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় অন্যান্য দেশের লোক নিজ দেশে চলে গেল কিন্তু 'ক' রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সরকারের নির্দেশে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। যুদ্ধে 'খ' রাষ্ট্র 'ক' রাষ্ট্রকে দখল করে নিল।

৩. 'ক' রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যান্য দেশের নাগরিকদের চলে যাওয়ার কারণ-

i. তারা 'ক' রাষ্ট্রের নাগরিক নয়

ii. 'ক' রাষ্ট্র তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করতে পারে না

iii. তারা 'ক' রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. iii

খ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. 'খ' রাষ্ট্র কর্তৃক 'ক' রাষ্ট্র দখল করে নেওয়ায় 'ক' রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি বিলুপ্ত হলো-

ক. জনসমষ্টি গ. ভূখণ্ড

খ. সরকার ঘ. সার্বভৌমত্ব

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জাকির সাহেব ও আফরিন দম্পতি চাকরি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০ বছরের অধিক সময় ধরে বসবাস করছেন। সেখানে তাদের ছেলে স্বননের জন্ম হয়। তারা সেখানে নিজেদের আয় থেকে একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ক্রয় করেন। সরকারকে নিয়মিত আয়কর দেন। দেশের আইনকানুন মেনে চলেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য একটি তহবিল পরিচালনা করেন। এই দম্পতি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

ক. নাগরিক কিসের পরিচয়ে নাগরিকত্ব লাভ করে?
খ. রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই নাগরিক নয় কেন?
গ. জাকির সাহেবের নাগরিকত্ব লাভের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জাকির সাহেব ও স্বননের নাগরিকতার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

২. বাংলাদেশের অধিবাসী সজীব সিঙ্গাপুরে মেরিন সার্ভিসে কর্মরত অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান মেয়েকে তিন বছর হয় বিয়ে করেছেন। সিঙ্গাপুর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকার একটি জাহাজে করে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছানোর পূর্বেই জাহাজে তাদের মেয়ে মারিয়ার জন্ম হয়। বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে আসা সজীবের ছোটো ভাই সাগর গত নির্বাচনে সেখানে ভোট দিতে পারেনি।

ক. বাংলাদেশের প্রথম সরকার কখন গঠিত হয়?
খ. দ্বৈত-নাগরিকত্ব বলতে কী বোঝায়?
গ. মারিয়া কোন দেশের নাগরিকত্ব লাভ করবে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'সজীব বা সাগরের নাগরিক অধিকার ভিন্ন'- উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের পরিবেশ

মানুষ নিজস্ব পরিবেশে বাস করে। পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তনে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পরিবেশও ভারসাম্য হারাচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে আমাদের পরিবেশগত সমস্যার প্রতিরোধে অনেক কিছু করণীয় আছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- পরিবেশের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশগত সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশগত সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- পরিবেশগত সমস্যার উপর প্রতিবেদন তৈরি করতে পারব;
- পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হব।

পাঠ-১ : মানুষ ও পরিবেশ

মানুষ নিজস্ব পরিবেশে জীবনযাপন করে। তার জীবন পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রকৃতির চারটি মূল উপাদান হলো- মাটি, পানি, বায়ু এবং আলো। আলো ও তাপের প্রধান উৎস হলো সূর্য। মাটির উপর জন্মানো গাছপালা পানি, বায়ু, তাপ ও আলোর সাহায্যে বেড়ে উঠে। এসবের উপর নির্ভর করেই এ পৃথিবীতে মানুষের বসতি সম্ভব হয়েছে।

সৃষ্টির শুরুতে মানুষ প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি থেকেই সে সবকিছু সংগ্রহ করেছে। ঘরবাড়ি তৈরিতে প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন করেছে। মাটিকে সে উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। মাটির উর্বরা শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, ক্ষয় আছে, তাতে যে খনিজ সম্পদ আছে সেগুলো হ্রাস পায়। বাকি তিনটি অর্থাৎ পানি, বাতাস ও তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়।

মানুষ যখন থেকে চাষবাস করে স্থিতিবস্থায় এসেছে, তখন থেকেই প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা চালিয়েছে। বনবাদাড় সাফ করে বড়ো এলাকা জুড়ে ফসলের ক্ষেত করেছে। ধান, গম, ভুট্টা আরও অনেক ফসল উৎপাদন করেছে। কিছু পশুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগিয়েছে। বন্য-পশুর মধ্যে

কোনোটিকে মেরে রান্না করে খেতে শিখেছে। আবার কোনোটিকে মেরে হয়ত চামড়াটি কাজে লাগিয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য হিংস্র পশুকে হত্যাও করেছে। নিজের প্রয়োজনে আবার মানুষ কিছু গাছপালা রোপণ করেছে, যা তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে।

কাজ - ১ : প্রকৃতির মূল উপাদানগুলোকে চিহ্নিত কর।
কাজ - ২ : মানুষ ও পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ চিহ্নিত কর।

পাঠ-২ ও ৩ : পরিবেশগত সমস্যা : কারণ ও প্রভাব

মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। বুদ্ধি খাটিয়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে। পানির শক্তি কাজে লাগিয়ে কল চালিয়েছে। এভাবে ক্রমেই তার প্রয়োজন মতো সে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বাড়িয়েছে। বড়ো বড়ো কলকারখানা বানিয়েছে, শহর গড়েছে, গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন চালাচ্ছে। শীতাতপ যন্ত্র বানিয়ে নিজের আরাম বাড়িয়েছে। এসব মিলিয়ে নানা রকম শব্দও বাড়ছে। শব্দদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মানুষ বাড়তে থাকায়, আর সবার মধ্যে ভালো ও আরামে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ায় পরিবেশের উপর চাপ বাড়ছে। বলা যায়, মাটি, পানি, বায়ু ও তাপের সাথে মানুষের জীবনযাপনের যে ভারসাম্য থাকা দরকার ছিল তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশও ভারসাম্য হারাচ্ছে। দূষণের কারণে ঢাকা শহরের অনেক শিশু শ্বাসকষ্টে ভুগছে। তাছাড়া হৃদরোগ, ক্যানসার, চর্মরোগ, নানা ধরনের অ্যালার্জি বাড়ছে।

ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার চাপ দেশের নগরগুলোতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনসংখ্যার বাসস্থানসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে না। ফলে নগরে বস্তির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বসতি ও শিল্প-কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনে দেশের অনেক জলাভূমি তা ব্যবহারের ধ্বংস হয়ে যায়। কখনো কখনো শিল্প কারখানার বর্জ্য নদীর পানিতে মিশ্রিত হয়ে বা বিষাক্ত ধোয়া বাতাসে মিশে যায় তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে জলজ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ের ঢালে এবং পাহাড়ের পাদদেশে ঘরবাড়ি নির্মাণের কারণে পাহাড় কাটা হয়। এছাড়া অনেক সময় ইটের ভাটার জন্যও পাহাড় কাটা হয়। এগুলো সবই পরিবেশগত সমস্যার কারণ। পরিবেশগত বিভিন্ন উপাদানের বাহুল্যতার কারণে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এতে উপকূলীয় এলাকার অনেকে গৃহহীন হয়ে পরিবেশগত উদ্বাস্তু হয়ে যায়।

একই জমি বারবার চাষ হওয়ার ফলে জমির স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি কমে যাচ্ছে। এখন মানুষ ভূমিতে জৈব সার ছাড়াও রাসায়নিক সার দিচ্ছে। সার তৈরি এবং কাপড়, ঔষধ, নানা সরঞ্জামসহ মানুষের বিপুল চাহিদা মেটাতে বেড়ে চলেছে কারখানা। এগুলো থেকে কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস আর যে বর্জ্য বেরিয়ে আসছে তা পানি ও বায়ুকে দূষিত করছে। তাছাড়া এর প্রভাবে তাপমাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে। তাপ বেড়ে যাওয়ায় জলবায়ু ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। এর ফলে অতিবৃষ্টি, খরা, ঝড়, বন্যা হচ্ছে।

আবার মানুষ বেড়ে যাওয়ায় এবং তাদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গাছপালা কাটা পড়ছে, প্রাকৃতিক বন উজাড় হচ্ছে। তাতে ভূমিক্ষয় আর তাপবৃদ্ধি ঠেকানো যাচ্ছে না। এমনকি এসবের ফলে সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুণি-রশ্মি ঠেকানোর জন্য পৃথিবীর মহাকাশে যে ওজোন স্তর আছে তাও ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে এক বীর ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার যা পরিবেশের স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পরিবেশগত সমস্যাঃ বায়ুদূষণ, মাটিদূষণ, পানিদূষণ

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেনের অফুরন্ত উৎস গাছপালা। নির্বিচারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে বাতাসে প্রত্যাশিত অক্সিজেনের পরিমাণ। ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় খাদ্য, ঔষধ, জ্বালানি ইত্যাদির জোগান। বাতাসে অক্সিজেনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী নানা গ্যাসের পরিমাণ।

আমাদের আরাম-আয়েশ নিশ্চিত করতে একইভাবে আমরা নিঃশেষ করে চলেছি খনিজসম্পদ, পশু-পাখি, নদী-নালাসহ প্রকৃতির নানা উপাদান। বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অনেক প্রজাতি যা কোনো না কোনোভাবে আমাদের টিকে থাকার লড়াইয়ে সহায়তা করত।

ক্রমাগত পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে দুই মেরুর বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। তাতে সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলোর নিম্নাঞ্চল ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর আরও অনেক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কাজ-১ : মানব সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা ও এর ক্ষতিকর দিকসমূহ চিহ্নিত কর।
কাজ-২ : বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা কেন ভবিষ্যত প্রজন্মের উদ্বেগের কারণ- ব্যাখ্যা কর।

পাঠ-৪ ও ৫ : বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে করণীয়

পরিবেশগত সমস্যার কারণে বাংলাদেশের জনগণের নানা প্রকার সমস্যা হয়। এ রকম সমস্যা কি আমরা হতে দিতে পারি? এ বিষয়ে জাতিসংঘ থেকে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকারও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের সবারই, এমনকি শিশুদেরও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা-

- অযথা গাছ কাটব না।
- ১ বার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করব।

- রিসাইক্লিং করা শুরু করব।
- যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলব না।
- যেসব গাড়ি থেকে কালোধোঁয়া বের হয় সেগুলো চলাচল বন্ধ করার জন্য সচেতন করব।
- লোকালয়ের কাছে শিল্পকারখানা না গড়তে সচেতন করব।
- বাড়ির বর্জ্য যথাস্থানে ফেলব। নর্দমায় কখনো শক্ত বর্জ্য ফেলব না।
- অযথা মাইক বাজিয়ে শান্তি নষ্ট করব না।
- হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও অফিস এলাকায় শব্দদূষণ করব না।
- পাহাড় কাটব না।
- নদী, খাল, হ্রদ বা সমুদ্রসহ ছোটো-বড় কোনো জলাধারে ময়লা ফেলব না।
- বন, পাহাড়, নদীসহ কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করব না।
- গাছ লাগাব ও গাছের যত্ন নেব।
- প্রকৃতির কাছাকাছি থাকব।
- মানুষের সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কারণগুলো জানব ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেব।
- উন্নয়নমূলক কাজে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেব।
- নিজের খাবার, পোশাক ও অন্যান্য জিনিস নির্বাচন ও ব্যবহারে পরিবেশের ভারসাম্যের কথা বিবেচনা করব।

কাজ : প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি প্রকৃতির মূল উপাদান?

ক. গ্যাস   গ. আলো

খ. বন   ঘ. ফসল

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে-

i. নগরে বস্তি বৃদ্ধি পায়

ii. নদীর পানি দূষিত হয়

iii. কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   গ. ii ও iii

খ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আজাদ তার গ্রামে গাছপালা কেটে এবং জলাশয় ভরাট করে একটি সাবানের কারখানা তৈরি করে। কারখানার মেশিনের শব্দে আশপাশের মানুষ অতিষ্ঠ। আজাদের চাচা চাকরি শেষে গ্রামে এসে খালি জায়গায় গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন। অপরিষ্কার খালগুলো পরিষ্কার করে পানি চলাচলের ব্যবস্থা করেন।

৩. আজাদের কার্যক্রমকে কী বলা যায়?

ক. মানুষ সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা
খ. প্রকৃতি সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা
গ. প্রকৃতিকে মানুষের জয় করার চেষ্টা
ঘ. প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা

৪. আজাদের চাচার কার্যক্রমের ফলাফল কোনটি?

ক. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে
খ. মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যাবে
গ. মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পাবে
ঘ. জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.
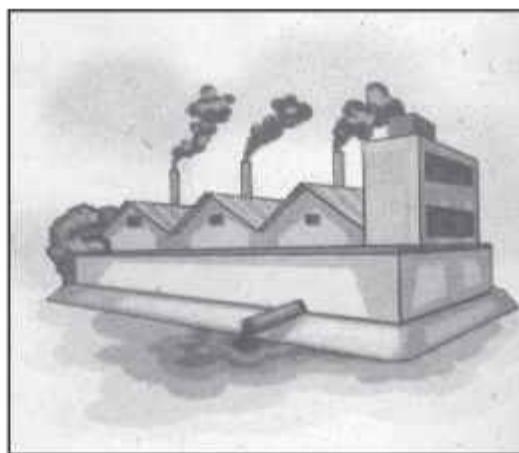
ক. আলো ও তাপের প্রধান উৎস কোনটি?

খ. মানুষ কীভাবে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বাড়িয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের চিত্রে কোন সমস্যাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে তোমাদের মতো শিশুদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা কর।

২.বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনির হোসেন ঢাকার অভিজাত এলাকায় একটি অত্যাধুনিক ফ্ল্যাটে বসবাস করেন। তার ছেলে-মেয়েরা বিনোদনের জন্য উচ্চ আওয়াজে গান শোনে, যা প্রায়ই তাদের প্রতিবেশীদের অসুবিধার সৃষ্টি করে। তার এপার্টমেন্ট ভবনে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য রয়েছে নিজস্ব জেনারেটর।

ক. মানুষ কখন থেকে প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা চালিয়েছে?

খ. প্রকৃতির মূল উপাদান কীভাবে মানুষের উপর প্রভাব ফেলে?

গ. মনির হোসেনের ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি পরিবেশে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে? বর্ণনা কর।

ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তোমার কি কোনো দায়িত্ব আছে বলে মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।

সপ্তম অধ্যায়

শিশুর বেড়ে ওঠা ও প্রতিবন্ধকতা: সামাজিকীকরণ

শিশুর বেড়ে উঠা শুরু হয় পরিবার থেকে। পরিবারের গণ্ডি পার হয়ে শিশুকে নতুন নতুন পরিবেশের সঙ্গেও খাপ খাওয়াতে হয়। নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলায় প্রক্রিয়ার নাম সামাজিকীকরণ। তবে সমাজে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে শিশুর বিভিন্ন ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ অতি জরুরি, অন্যথায় মানসিক সমস্যা নিয়ে শিশুদেরকে বেড়ে উঠতে হবে। এ অধ্যায়ে আমরা সমাজে শিশুর বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারণা ও এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সামাজিকীকরণের মাধ্যম ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- শিশুশ্রমের ধারণা, কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব কী হওয়া উচিত তা বর্ণনা করতে পারব;
- সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানবিক ও সামাজিক গুণাবলি রপ্ত করে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে যোগ্যতা অর্জন করব;
- শ্রমজীবী শিশুর অধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে সচেতন হব।

পাঠ- ১ : সামাজিকীকরণ ও সমাজজীবনে এর প্রভাব

সমাজে আমরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠি। সামাজিক জীব হিসেবে পরিচিতি লাভ করি। সমাজ থেকে আমরা যা শিখি সেটা আমাদের সামাজিক শিক্ষা। এ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- সমাজের নিয়ম-নীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ইত্যাদি। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সামাজিক শিক্ষা

আয়ত্ত করে সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হই তাকে সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন শিশুর প্রাথমিক অভাব পূরণ করে তার মা। এ কারণে মা শিশুর অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়। কিছুকাল পরে শিশু বাবাসহ অন্যান্য মানুষের উপস্থিতি উপলব্ধি করে এবং তার সামাজিক সম্পর্কের গণ্ডি আরও বিস্তৃত হয়। পরবর্তীকালে শিশু প্রতিবেশী, সমবয়সী, খেলা ও পড়ার সাথি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে সামাজিক জীবে পরিণত হয়। এভাবে শিশু আদর্শ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, দায়িত্ব, কর্তব্য, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলি আয়ত্ত করে সামাজিক জীব হিসাবে ভূমিকা পালনে উৎসাহিত হয়।

সমাজজীবনে সামাজিকীকরণের প্রভাব অনেক। এ প্রক্রিয়া শিশুকে সামাজিক মানুষে পরিণত করে। সুস্থ ও সুন্দরভাবে বিকশিত হতে ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। শিশুকে সমাজের দায়িত্বশীল সদস্যে পরিণত হতে এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এ প্রক্রিয়া শিশুকে সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী আচরণ করতেও শেখায়। যেমন- আমাদের সমাজ প্রত্যাশা করে, নারী-পুরুষ সকলেই একে অন্যের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এ কাজে আমরা অভ্যস্ত হলে সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ীই আচরণ করা হবে। সামাজিকীকরণ শিশুর জীবনে প্রয়োজনীয় দক্ষতারও বিকাশ ঘটায়। অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে শিশু নিজ জীবনের অনেক ঝুঁকি ও সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে।

কাজ - ১ : শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।
কাজ - ২ : সামাজিকীকরণের বাহনগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ - ৩ : দলে ভাগ হয়ে সমাজজীবনে সামাজিকীকরণের প্রভাব চিহ্নিত করে উপস্থাপন কর।

পাঠ-২ ও ৩: সামাজিকীকরণের মাধ্যম ও এর গুরুত্ব

সামাজিকীকরণের কতিপয় মাধ্যম ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো-

পরিবার: শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয় পরিবার থেকে। শিশুর চারিত্রিক গুণাবলি পারিবারিক পরিবেশে বিকশিত হয়। সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষা শিশু পরিবার থেকে অর্জন করে। শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য প্রয়োজন হয় সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ। পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক মধুর হলে শিশু সুন্দর পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে। অপরপক্ষে, পারিবারিক অশান্তি দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মারামারি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে শিশুর বেড়ে উঠার জন্য সবসময় সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখা উচিত। পরিবার সম্প্রীতিও সৌহার্দের চর্চা না হলে শিশু তা শিখতে পারে না। কাজেই সততা ও সৌহার্দের শিক্ষা পরিবার থেকেই শিখতে হয়।

প্রতিবেশী: আমাদের বাড়ির আশপাশে যারা বসবাস করেন তারা হলো আমাদের প্রতিবেশী। পাশাপাশি বাড়িগুলোর সমবয়সী শিশুদের নিয়ে একটি প্রতিবেশী দল গড়ে উঠতে পারে, যার মাধ্যমে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমতা, ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্জন করতে পারি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি কতগুলো সামাজিক আদর্শও শিখে থাকে। এসব আদর্শ হচ্ছে-শৃঙ্খলাবোধ, দায়িত্ববোধ, নিয়মানুবর্তিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, পারস্পরিক ভালোবাসা ইত্যাদি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে শিশু বৃহত্তর সমাজের আদব-কায়দা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধও শিখে থাকে। শিশুর মধ্যে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার শিক্ষা এখান থেকেই হয়। ফলে পরার্থ শিখতে পারে স্কুল থেকে। শিশুর সুঅভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুও শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। সামাজিকীকরণে তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খেলা ও পড়ার সাথি: শিশুর সামাজিকীকরণে খেলা ও পড়ার সাথির ভূমিকা কম নয়। শিশু খেলা ও পড়ার সাথির সাথে মেলামেশা করে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে পারে। ভালো-মন্দ গুণাবলির সমালোচনা শুনে সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শেখে। তবে মন্দ খেলা ও পড়ার সাথি অনেক সময় শিশুকে বিপথগামী করতে পারে। তাই খেলা ও পড়ার সাথি নির্বাচনে আমরা সচেতন হব।

ধর্ম: ধর্ম হচ্ছে এক ধরনের বিশ্বাস, যা নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রতিটি ধর্মেরই মূল বিষয় হচ্ছে ব্যক্তিকে ন্যায় ও কল্যাণের প্রতি আহবান করা এবং অন্যায় ও অকল্যাণ থেকে দূরে রাখা। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ধর্ম মানুষের মনে সামাজিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে, সহযোগিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি গুণাবলির অধিকারী করে। সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। আমরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এবং অন্য কেও তার ধর্ম মেনে চলার সুযোগ দিলে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব।

গণমাধ্যম: জনগণের কাছে সংবাদ, মতামত, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করার মাধ্যমকে বলা হয় গণমাধ্যম। গণমাধ্যমসমূহ যেমন- সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিনে সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য থাকে যা শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে। বেতার নানা ধরনের বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে শিশুর সামাজিকীকরণে ভূমিকা রাখে। একই সাথে দেখা ও শোনার মাধ্যমে টেলিভিশন থেকে সংগৃহীত তথ্য শিশুর সামাজিকীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। চলচ্চিত্রও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যদি তা শুধু বিনোদনধর্মী না হয়ে আদর্শ ও বাস্তবধর্মী শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র হয়। এ ধরনের চলচ্চিত্র শিশুর মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইদানিং ইন্টারনেট শিশুর বিনোদন ও সামাজিকীকরণের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বড়োদের ভূমিকা রাখতে হবে।

কাজ - ১ : শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা চিহ্নিত কর।
কাজ - ২ : শিশুর সামাজিকীকরণে খেলার সাথি ও পড়ার সাথির ভূমিকা চিহ্নিত কর।

পাঠ-৪ ও ৫: শিশুশ্রমের ধারণা, কারণ ও প্রভাব

আমরা প্রায়ই লক্ষ করি অনেক শিশু বিদ্যালয়ে না গিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। আবার অনেক শিশু বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন রকম কাজ করে। তবে কোনো কোনো কাজ প্রায় প্রতিটি শিশুকে করতে হয় যা তার জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং তা তার ও তার পরিবারের ভালোভাবে জীবনযাপনের জন্য সহায়ক। যেমন- মা-বাবার বা পরিবারের সদস্যদের কোনো কাজে সহায়তা করা। এসব কাজ করতে সে বাধ্য থাকে না। কিন্তু কোনো কোনো কাজ আছে যা শিশুর জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের কাজকে শিশুশ্রম বলা হয়। সুতরাং উপার্জন করার জন্য কাজ করতে গিয়ে শিশুরা বিপদ, ঝুঁকি, শোষণ ও বঞ্চনার সম্মুখীন হলে সে কাজকে শিশুশ্রম বলা হয়। বাংলাদেশে শিশুশ্রম বেআইনি।

আমাদের দেশের অনেক শিশু অন্যের বাসাবাড়িতে সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করছে। বাসাবাড়ির বাইরেও বিভিন্ন কলকারখানায় যেমন-চুড়ি, বিড়ি, ব্যাটারি, জুতা তৈরির কাজ করছে। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির কারখানায়, লেদ ও ওয়েল্ডিং মেশিনেও কাজ করছে। গাড়ি বা টেম্পুর সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছে। বর্জ্য ঘেটে তা থেকে প্রয়োজনীয় বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করছে। কিন্তু কেন শিশুরা এসব কাজ করছে?

শিশুশ্রমের কারণ অনেক। অনেক অভিভাবক দরিদ্রতা বা পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে শিশুদের স্কুলের পরিবর্তে কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়। আবার মা-বাবা অসুস্থ হলে কিংবা তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে অনেক সময় শিশুরা অর্থ উপার্জনে বাধ্য হয়। খুব কম মজুরিতে শিশুদের পাওয়া যায় বলে গৃহকর্মে বা ইটের ভাটার মতো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম ব্যবহার হয়। এছাড়া বড়ো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর প্রতি অভিভাবকদের বৈষম্যমূলক আচরণও অনেক সময় মেয়ে শিশুকে শ্রমিকে পরিণত করে।

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। অতিরিক্ত শ্রমের কারণে নানা ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। একই বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে যেতে দেখে, খেলতে দেখে এবং মা-বাবার সাথে বেড়াতে যেতে দেখে শিশু শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারাও এসব পেতে চায়। তাই চাহিদার অপূর্ণতা থেকে শিশু মনে হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়। শিশু স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে

শিশু মনে এক প্রকার হিংস্রতা ও ক্ষিপ্রতার জন্ম নেয়। এসব শিশু আবেগহীন, ভয়হীন হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। অপুষ্টি, অনিদ্রা, বিশ্রামহীন জীবন শিশু শ্রমিকের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। আমরা জীবনের জন্য ক্ষতিকর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখব এবং অন্যদেরকে বিরত থাকতে সহায়তা করব।

শিশুশ্রম : শিশু ইট ভাঙছে

কাজ : দলে ভাগ হয়ে ৫টি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও এগুলোর ক্ষতিকর দিক চিহ্নিত কর।

পাঠ-৬: শ্রমজীবী শিশুর প্রতি আমাদের মনোভাব

তোমাদের বয়সের অনেক ছেলে-মেয়ে বাসাবাড়িতে, কলকারখানায় কিংবা অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে কাজ করে। অনেক সময় এসব শিশু যথাযথ পারিশ্রমিক, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা পায় না। স্নেহ, মায়া, মমতা কী এসব শিশু তা জানে না। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তাদের নিত্যসঙ্গী। অথচ তাদেরও আছে বিকশিত হবার অধিকার।

আমাদের তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিতে হবে। বাসায় কোনো শিশু কাজ করলে তার কাজে সাহায্য করতে পারি। নিজের কিছু কাজ যেমন- ঘর, বিছানা, টেবিল গুছিয়ে রাখা, শুকনা কাপড় ভাঁজ করে রাখা ইত্যাদি নিজে করতে পারি। এতে শিশুটির উপর কাজের চাপ কমবে। কোনো সময়ে শিশুটি অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা ও সেবাযত্ন করে তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারি। এতে সে বন্ধু হয়ে উঠবে। খেলাধুলায় তাকে সাথি করতে পারি। শিশুটিকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। এতে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা হবে। ভেবে দেখো, এসব শিশুকে আমরা আর কীভাবে সাহায্য করতে পারি।

ভালো পরিবেশে শিশুরা বেড়ে উঠলে পরিবার ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে। এসব শিশুর প্রতি ভালো আচরণের মাধ্যমে আমরা নিজেরাও মানবিক গুণসম্পন্ন একজন নাগরিক হয়ে উঠব। আমরা পরিবারের অন্যান্যদেরও তাদের প্রতি ভালো আচরণ করার জন্য বলব।

কাজ : বাড়ির কাজে সহায়তাকারীর প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয় কোনটি থেকে?

ক. খেলার সাথি   গ. প্রতিবেশী

খ. পরিবার   ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২. শিশুশ্রমের কারণ-

i. শিশুদের অবাধ্যতা

ii. পারিবারিক আর্থিক সংকট

iii. পারিবারিক অশান্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   গ. ii ও iii

খ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গিয়ে শুভ পথ হারিয়ে ফেলে। পথ চিনিয়ে দেওয়ার কথা বলে এক লোক তাকে পার্শ্ববর্তী দেশের কিছু অপরিচিত লোকের হাতে তুলে দেয়। শুভকে হারিয়ে ছোটো ছেলে সামীকে বাবা-মা লেখাপড়া, গান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই যোগ্য করে তোলার জন্য অতিরিক্ত চাপ দেন।

৩. শুভ কোন সমস্যার শিকার?

ক. শিশুশ্রম   গ. শিশু নির্যাতন

খ. শিশুপাচার   ঘ. শিশু অপহরণ

৪. সামীর ক্ষেত্রে যা ঘটতে পারে তা হলো-

i. সে অত্যধিক মেধাবী হবে

ii. তার খাওয়ায় অরুচি হবে

iii. কাজে অনীহা দেখা দেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তেরো বছর বয়সী মোহন জুতার কারখানায় কাজ করে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করতে করতে মাঝেমাঝে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পনেরো বছরের মলি এক বাসায় কাজ করে। সেখানে তাকে ভালো খাবার খেতে দেয়, বেড়াতে নিয়ে যায়, ঈদের সময় তার পছন্দের পোশাক কিনে দেয়। কাজের অবসরে তাকে পড়ার সুযোগও দেয়।

ক. ভালোভাবে জীবনযাপনের জন্য কোন কাজ শিশুদের উপযোগী?

খ. প্রতিবন্ধকতা শিশুর জীবনে কী প্রভাব ফেলে ব্যাখ্যা কর।

গ. মোহনের কাজ কোন ধারণাকে প্রতিফলিত করে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মলির কর্মক্ষেত্রে তার প্রতি আচরণ মূল্যায়ন কর।

২. মায়ের উদ্যোগে মিলি তার বন্ধুদের নিয়ে একটি ক্লাব গঠন করে। কেউ বিপদে পড়লে এই ক্লাবের সকলে মিলে সাহায্য করে। অন্যদিকে মিলির ভাই ও তার বন্ধুরা মিলে একটি সংগঠন করে যেখানে তারা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়ে। জীবনধর্মী বিভিন্ন ছবি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিতর্ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখে।

ক. সামাজিকীকরণ কী?

খ. ব্যক্তির সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

গ. মিলি সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যমকে ফুটিয়ে তুলেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিলির ভাই ও তার বন্ধুদের কর্মকাণ্ড তাদের সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে কি তুমি মনে কর? মতামত দাও।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক সহযোগিতা

বর্তমানে আধুনিকযুগে কোনো রাষ্ট্রই এককভাবে তাদের প্রয়োজন সম্পন্ন করতে পারে না। এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। গড়ে তুলেছে বিভিন্ন সহযোগিতা সংস্থা। এদের মধ্যে অন্যতম হলো জাতিসংঘ। বিশ্বে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে জাতিসংঘ গঠন করা হয়। বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। যেমন- সার্ক, আসিয়ান, ইইউ প্রভৃতি। এসব সংস্থা তাদের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করে। আমরা পঞ্চম শ্রেণিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা, জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা ও সার্ক সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ের পাঠগুলোতে আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একই অঞ্চলভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র উল্লেখ করতে পারব;
- বিশ্বের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার গঠন এবং কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব;
- পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ - ১ ও ২ : আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব ও এর ক্ষেত্র

আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমস্যা ও প্রয়োজন বিভিন্ন রকম। কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই এককভাবে তার সকল প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। অথচ এ সমস্ত প্রয়োজন ও সমস্যার সমাধান না হলে কোনো রাষ্ট্রের জনগণেরই কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্ভব হয় না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো যদি পরস্পরকে সহযোগিতা করে তাহলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়। তাই একই অঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলো পরস্পর সহযোগিতা করে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে উঠে। তারা যৌথ উদ্যোগে এসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বাধাসমূহ দূর করার জন্য কাজ করে। ফলে সকল পক্ষের উন্নয়ন সাধন হয়।

আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র

আঞ্চলিক সহযোগিতার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ক্ষেত্রসমূহ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে- শিল্প-বাণিজ্য, নিরাপত্তা, জ্বালানি, তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি, পর্যটন, ক্রীড়া, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধ, পরিবহন ও যোগাযোগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিনিময়, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, জলবায়ু ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি।

কাজ : আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৩ ও ৪ : উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাসমূহ

অবস্থানগত সুবিধার ভিত্তিতে পৃথিবীতে অনেক আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে উঠেছে। আমরা এ পাঠে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে জানব।

সার্ক (SAARC)

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মিলে গঠন করেছে সার্ক। সংস্থাটির পুরো নাম-South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)।

বাংলায় বলা যায়-দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। বাংলাদেশের উদ্যোগে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়া সার্কের অন্য সদস্য দেশগুলো হলো- ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভুটান ও আফগানিস্তান। এছাড়া বর্তমানে মিয়ানমার পর্যবেক্ষক হিসাবে এ সংস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে। সংস্থাটির মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা হলেও এর কর্মক্ষেত্র সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, প্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রেই বিস্তৃত। সার্কের সদর দপ্তর নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত।

সার্ক গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য।
- কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা।
- সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলা।
- উক্ত অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে কাজ করা।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা।

আসিয়ান (ASEAN)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি দেশ নিয়ে ১৯৬৭ সালের ৮ই আগস্ট গঠিত হয় আসিয়ান। সংস্থাটির পুরো নাম-Association of South-East Asian Nations (ASEAN)। বাংলায় বলা হয়-দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা। এর সদস্যদের মধ্যে রয়েছে- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, লাওস, মিয়ানমার, সিঙ্গাপুর। আসিয়ানের সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়।

আসিয়ান গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সম্মিলিত উদ্যোগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা।
- উক্ত অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে সৌহার্দ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ করা।
- পেশাগত ও কারিগরি ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা।
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা ইত্যাদি।

কাজ - ১ : এশিয়ার মানচিত্রে আসিয়ান ও সার্কভুক্ত দেশগুলো দেখাও।
কাজ - ২ : সার্ক কোন কোন কাজগুলো করতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ - ৩ : আসিয়ান কোন কোন কাজগুলো করতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রথমে গঠন করেছিল কমন মার্কেট। তারপর এর আওতা বেড়ে হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU)। ইউরোপের প্রায় সব দেশই এর সদস্য। ইইউ তার নিজস্ব মুদ্রাও চালু করেছে, যার নাম 'ইউরো'। ইউরোপের সব দেশেই তাদের দেশীয় মুদ্রার পাশাপাশি এই ইউরোও চলে। সদস্য দেশগুলোর নাগরিকেরা আজ অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত, বসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্-এ অবস্থিত।

এছাড়া 'জি-৭' নামে আন্তঃসরকারি সহযোগিতা সংস্থা রয়েছে। এটি শিল্পোন্নত শীর্ষ সাত দেশের একটি জোট। সাত সদস্যের এই সংস্থায় আছে-যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, কানাডা ও ইতালি। এই গ্রুপ কেবল নিজেদের মধ্যে সহযোগিতাই করে না, আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহযোগিতা দেওয়ার বিষয়েও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। তাছাড়া পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যু এবং দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের অভিশাপমুক্ত পৃথিবী গড়ার বিষয়ে তাদের করণীয় নিয়েও আলোচনা ও নিজস্ব কর্মকৌশল নির্ধারণ করে জি-৭।

আফ্রিকার দেশগুলো মিলে গড়ে তুলেছে ওএইউ বা Organization of African Unity (OAU); আরব দেশগুলোর সংগঠন আরবলীগ; মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ওআইসি বা Organization of Islamic Cooperation (OIC)। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোকে নিয়ে গড়ে উঠেছে কমনওয়েলথ; আবার কোনো সামরিক জোটের সদস্য নয় এমন দেশগুলো নিয়ে গড়ে উঠেছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বা Non-Aligned Movement (NAM)। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

এছাড়া দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পন্ন হয়। বর্তমানে এ ধরনের চুক্তি বেড়েই চলেছে। কারণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হলো এই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি।

কাজ : আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ কীভাবে উপকৃত হয় তা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সার্কের মূল লক্ষ্য কী?

ক. সামাজিক সহযোগিতা গ. সাংস্কৃতিক সহযোগিতা

খ. অর্থনৈতিক সহযোগিতা ঘ. শিক্ষা সহযোগিতা

২. ইইউ'র নিজস্ব মুদ্রার নাম কী?

ক. ডলার গ. ইউরো

খ. পাউন্ড ঘ. রুপি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

জাপান, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের আরও পাঁচটি দেশ বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে পরিবেশ রক্ষাসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহায্য করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

৩. উদ্দীপকে কোন সংস্থার কথা বলা হয়েছে?

ক. ইইউ
খ. ওএইউ
গ. জি-সেভেন
ঘ. এনএএম

৪. উল্লিখিত সংস্থাটি কাজ করছে-

i. নিজেদের জন্য
ii. স্বল্পোন্নত দেশের জন্য
iii. দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়তে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাহাতের নেপালি বন্ধু গোমেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাহাত বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে নেপালের শিল্পকলা একাডেমিতে গান পরিবেশন করেন। রাহাত নেপালে অবস্থান কালে গোমেজের বাড়িতে বেড়াতে যান।

ক. আসিয়ানের পূর্ণরূপ কী?
খ. দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. নেপালে গিয়ে রাহাতের গান পরিবেশন করা সার্কের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত কাজটি ছাড়াও সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে কাজ করে- বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৫

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ষষ্ঠ–বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

একতাই বল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।